৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

আনন্দমেলা

বিশেষ আকর্ষণ : টেবিল-টপ ক্রিকেট

হারানো সোনার খনির খোঁজে অ্যাডভেঞ্চার

স্কুলের কম্পিউটার : কীভাবে প্রোগ্রাম করতে হবে

সুপারহিরো

ব্যাটম্যান

ব্যাটম্যানকে কেন বলা হচ্ছে সুপারহিরো ! কে এই ব্যাটম্যান ?

আপনার রঙরূপের বয়েস কি আপনার
আসল বয়েসের চেয়েও বেশী দেখাচ্ছে?
আপনার রঙরূপের জৌলুষ কাল কেমন থাকবে, তা নির্ভর করে, আজ আপনি তার কিভাবে দেখাশোনা করছেন, তার ওপর। কারণ, বয়েস বাড়ার সাথে সাথে,ত্বকের আর্দ্রতা কমে যেতে থাকে—তাই, দরকার, জনসন্স বেবী লোশন-এর ময়েশ্চারাইজিং-এর গুণ।
এ পাবেন আপনার বেছে নেওয়ার মত দুটি ফর্মুলেশনে—লোশনটি ত্বকের গভীরে ঢুকে কাজ করে, আর এর বিশেষ ময়েশ্চারাইজিং গুণ ত্বকে পুষ্টি যোগায়—আর, আপনার ত্বক অপূর্ব কোমল ও তরতাজা ক'রে রাখে, ফলে আপনার রঙরূপেও যেন চির-বসন্তের ছোঁওয়া লাগে!
রেগুলার
শুষ্ক ত্বকের জন্যে
এক বিশেষ
ময়েশ্চারাইজারযুক্ত
উপাদানের মিশ্রণ
REGULAR FORMUL
Johnson's
baby
lotion
LOW OIL FORMULA
Johnson's
baby
lotion
Johnson & Johnson
জনসন্স বেবী লোশন
কারণ, নরম ও মোলায়েম ত্বক আপনার বয়স গোপন রাখে।
OBM/4573 BEN

ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটে তোলা কখনো যায়না ভোলা

মা!

সুহাসিনী, লজ্জাবতী। কত কাল আগের ছবি।
ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটের ছবি, চিরকালের তরে,
অম্লান ছবিটি রাখে যে ধরে। স্মৃতির
মণিকোঠায়,চিরকাল উজ্জ্বল রয়।
আমার কল্পনায় আসে – মায়ের মধুর হাসিটি ভাসে।

INDU

ইন্দু ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট ফিল্ম
রাখে ধরে, চিরতরে।

Sista's – HPF.1313.89 BEN A

হি ন্দু স্তা ন ফ টো ফি ল্ম স ম্যা নু ফ্যা ক্ চা রিং কো ম্পা নী লি মি টে ড

Disproportionate
Returns for
SMALL
INVESTMENTS
&
What more &
Old age Pension too.

INVEST in your CHILD'S STUDIES.

In doing so:

1) You have done your duty to your child.
2) You have assured him good future too.
3) You have insured your future too.

What steps You have to take?

ADMISSION TO TURNING POINT SCHOOL

Can be a TURNING POINT in the life of your child.

* **An Exclusively English Medium Boarding School**

Admission open from Class I to VII.
One class will be added each year till Class X.
(CBSE syllabus)
It is a SCHOOL Sponsored & run by

LINKMAN INSTITUTE

52/B Rash Behari Ave Jn.
(Lane opp. Gurudwara)
Calcutta 700 026
Mon-Sat: 6 am—8 pm. Sun: 12 noon—6 pm

Enquiries: Phone: 46-5137.

* The School is within greater Calcutta.

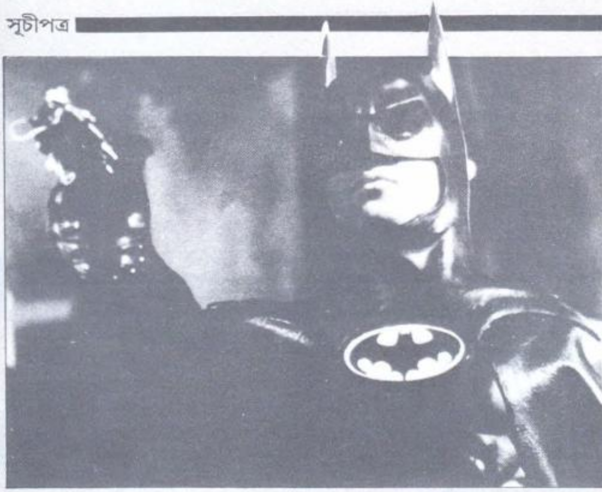

১২

কালো মুখোশের আড়ালে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। পেশীবহুল চেহারা। পোশাক-পরিচ্ছদে অদ্ভুত একটা ছাপ। হঠাৎ দেখলে অর্ধেক বাদুড় আর অর্ধেক মানুষ বলে ভ্রম হয়। কিন্তু এই হল ব্যাটম্যান। তাকে নিয়ে কমিক্স ও চলচ্চিত্র সারা দুনিয়ায় এখন শোরগোল তুলেছে। কে এই ব্যাটম্যান যাকে সবাই 'সুপারহিরো' বলে মেনে নিয়েছে? এবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে এই প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়েছে বিশদভাবে। রক্তমাংসের মানুষ ব্রুস ওয়েন-এর ব্যাটম্যান হয়ে ওঠার কাহিনী রোমাঞ্চকর গল্প-উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক। আর তাই ব্যাটম্যানের জনপ্রিয়তা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

২০

দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার খ্যাতি সারা বিশ্বে। বিখ্যাত অনেক নাট্যপরিচালক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম যুক্ত হয়ে আছে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। এখানে নাটকের বিভিন্ন বিষয় কীভাবে শেখানো হয়, ভর্তি হতে গেলে কী করতে হবে, পড়াশোনার খরচ কত, পাশ করার পর পেশাগত কী কী সুযোগ-সুবিধা আছে—এ ধরনের নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে এবারের 'কেরিয়ার গাইড' বিভাগে।

৩২

এখন অনেক স্কুলেই কম্পিউটার এসে গেছে। কম্পিউটারকে জানিয়ে দিতে হবে কী ধরনের কাজ আমরা তার কাছে চাই। পরিসংখ্যানের সব তথ্য তাকে জানাতে হবে। তা হলেই সে চটপট অনেক কাজ করে দেবে।

৩৮

ভারতীয় ক্রিকেট দলে তরুণদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। ফাস্ট বোলার অতুল ওয়াসন এই তরুণদেরই অন্যতম। রঞ্জি ট্রোফির আঞ্চলিক পাঁচটি ম্যাচে মোট ৪০টি উইকেট নিয়ে তিনি রীতিমত সাড়া জাগিয়েছিলেন। এই বোলিংই নিউজিল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলে তাঁর স্থান পাকা করে দেয়। ওয়াসনের একান্ত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রকাশিত হল একটি লেখা। ওয়াসন জানিয়েছেন, নিউজিল্যাণ্ড সফরে তিনি যে ভারতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হবেন সে-বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। ইয়র্কশায়ার লিগে তিনি মার্টিন ক্রো, গ্রেটব্যাচ ও রাদারফোর্ডের বিরুদ্ধে আগেই বল করেছেন। এই অভিজ্ঞতা নিউজিল্যাণ্ড সফরে তাঁর কাজে লাগবে। ওয়াসন কতটা সফল হবেন সেটাই এখন লক্ষ করার বিষয়।

■ আগামী সংখ্যায় ■

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদকাহিনী
বীর সামুরাই

পবিত্রকুমার চক্রবর্তীর প্রযুক্তিবিজ্ঞান
স্কুলের কম্পিউটার

শিবতোষ ঘোষের সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)
সাধুচরণের বাগাল

অমর দাশের কেরিয়ার গাইড
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট

ওয়াসিম আক্রমের রঙিন পোস্টার

২৪ মাঘ ১৩৯৬ □ ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০
১৫ বর্ষ ২১ সংখ্যা

আনন্দমেলা

সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)
সাধুচরণের বাগাল শিবতোষ ঘোষ ৬০

গল্প
গোবিন্দ কবিরাজ হিমানীশ গোস্বামী ২২

প্রচ্ছদকাহিনী
সুপারহিরো ব্যাটম্যান সুভাষ চক্রবর্তী, গৌতম চক্রবর্তী ১২

ধারাবাহিক উপন্যাস
উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৭
সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৫০

কমিক্‌স
রোভার্সের রয় ৪৭, টারজান ৫৩, গাবলু ৫৪, টিনটিন ৭১, ব্যাটম্যান ৭৩

কবিতা
রাজার বাড়ি দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায় ৩৭
তেপায়া টেবিল সুদেষ্ণা সরকার ৩৭

টাকাকড়ি
টাকার জন্ম : প্রথম পর্ব
ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১০

প্রযুক্তিবিজ্ঞান
স্কুলের কম্পিউটার পবিত্রকুমার চক্রবর্তী ৩২

কেরিয়ার গাইড
দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা··· অমর দাশ ২০

অ্যাডভেঞ্চার
সোনা-গিরির সোনার খনি সঙ্কর্ষণ রায় ৭

বিদ্যালয়-পরিচিতি
পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ
বিশ্বদেব বিশ্বাস ৭৬

খেলাধুলো
অতুল ওয়াসনের বড় অস্ত্র··· মানস চক্রবর্তী ৩৮
খেলার খবর ৪০
মাঝমাঠের লড়াই গৌতম সরকার ৪৫
বিশ্বকাপ হকি জিতবে কি ভারত সুব্রত সরকার ৪৯
আশ্চর্য খেলা : টেব্‌ল টপ ক্রিকেট সিদ্ধার্থ ঘোষ ৮০

নিয়মিত বিভাগ
চিঠিচাপাটি ৬, কে প্রথম ২৬, আঁকিবুকি ২৮, হাসিখুশি ২৮, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ৩০, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৫৫, কুইজ ৫৬, বাইরের জানালা ৫৯, আকাশে ওড়ার কথা ৬৪, শব্দসন্ধান ৭০, বইয়ের খবর ৭৫, নানারকম ৭৯

প্রচ্ছদ
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ অসিত পাল, প্রবীর সেন

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার। দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

চিঠিচাপাটি

টারজানকে নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনী

সুন্দর সুন্দর অনেক বিষয় নিয়ে 'আনন্দমেলা'য় প্রচ্ছদকাহিনী পড়ি। এটি আমার খুব প্রিয় পত্রিকা। আমার একটি অনুরোধ, আপনারা টারজানকে নিয়ে একটি প্রচ্ছদকাহিনী ছাপুন।

শুভদীপ সেনগুপ্ত
স্কটিশচার্চ কলিজিয়েট স্কুল, কলকাতা-৩০

সম্পাদকীয় উত্তর : টারজানকে নিয়ে আনন্দমেলায় প্রচ্ছদকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে ৬ অগস্ট ১৯৮৬ সংখ্যায়। ওই সংখ্যায় টারজানকে নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছিল।

ছবিতে মহাকাশ অভিযান একককথায় অপূর্ব

'আনন্দমেলা' ২৭ ডিসেম্বর 'মহাকাশ অভিযান সংখ্যা' পড়লাম। খুব ভাল লাগল। ছবিতে মহাকাশ অভিযান বিষয়টিও অভিনব। বেশির ভাগ সংখ্যায় দেখি দু'পাতা জোড়া খেলোয়াড়দের ছবি। প্রতি সংখ্যায় খেলোয়াড়দের ছবি না দিয়ে অন্যান্য বিভাগের, যেমন—সঙ্গীত, সাহিত্যের বিখ্যাত মানুষদের ছবি বা প্রচ্ছদকাহিনী বিষয়ক পোস্টার কি দেওয়া যায় না?

মানস হালদার, তৃষ্ণা হালদার
আগরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

নিয়মিত আনন্দমেলা পড়ি। প্রতিটি সংখ্যায় আমাদের এই পত্রিকাটি তার বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে উপস্থিত হয়। দিন দিন নানা ধরনের লেখা আমাদের সামনে তুলে ধরছে। ২৭ ডিসেম্বর সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী 'মহাকাশ অভিযান সংখ্যা' অজানা মহাকাশের সঙ্গে আমাদের দারুণভাবে পরিচয় করিয়ে দিল। একককথায় 'ছবিতে মহাকাশ অভিযান' অতুলনীয়। এই সংখ্যায় মহাকাশচারীদের স্পেস-সুটের বিবরণ খুব সুন্দরভাবে দেওয়া হয়েছে।

মনোজকুমার ঘোষ
যোরহাট, অসম

সব সংখ্যা 'আনন্দমেলা'ই আমি মন দিয়ে পড়ি। ২৭ ডিসেম্বর সংখ্যায় 'ছবিতে মহাকাশ অভিযান' পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। 'কাউন্ট ডাউন' খেলাটি পেয়ে দারুণ লাগল। কিন্তু সিদ্ধার্থ ঘোষের কাছে আমার একটি অনুরোধ, কীভাবে কাউন্ট ডাউন খেলার রকেটগুলো তৈরি করব, তা যদি জানতে পারি খুব আনন্দিত হব। দেবব্রত মৈত্রের 'প্রতিবন্ধী হরিণ' গল্পটি পড়ে খুব ভাল লাগল। শিশিরকুমার দাশের লেখা 'আর্গোস' উপন্যাস পড়ে দারুণ লেগেছে।

চুনি সিংহ
সপ্তম শ্রেণী
শিক্ষাসত্র বিশ্বভারতী

আমি 'আনন্দমেলা' সব সংখ্যাই পড়ি। ২৭ ডিসেম্বর সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী 'ছবিতে মহাকাশ অভিযান' পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। কাউন্ট ডাউন খেলাটি অপূর্ব। এই খেলাটি খেলে খুব ভাল লেগেছে। আশা করি আপনারা এরকম আরও কিছু বিজ্ঞানের খেলা প্রকাশ করবেন।

সন্দীপ দাস
কদমা, জামশেদপুর

'ছবিতে মহাকাশ অভিযান' ২৭ ডিসেম্বর সংখ্যা 'আনন্দমেলা'য় পড়লাম। এই সংখ্যাটি আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার আরও বেশি ভাল লেগেছে 'আশ্চর্য খেলা কাউন্ট ডাউন।'

অনিমেষ কুমার
কেওটারা, বর্ধমান

লেখকের উত্তর : 'কাউন্ট ডাউন' খেলার রকেটগুলো তৈরি করে নেওয়া খুব সহজ। কাউন্ট ডাউন খেলার পাতায় যে রকেটগুলো আছে, তার উপর সাদা কাগজ ফেলে পেনসিল দিয়ে দাগ টেনে তারপর কাঁচি দিয়ে কেটে নিতে হবে। আটটা রকেট কাটা হয়ে গেলে একটি রঙে দুটো করে রকেট রং করে নিলেই হয়ে গেল। অর্থাৎ, একজন প্রতিযোগীর জন্য এক রঙের দুটি করে রকেট থাকবে।

খেলোয়াড়দের ছবি

সকলের প্রিয় এবং আমার প্রিয় পত্রিকা 'আনন্দমেলা'কে আরও আকর্ষক করে তোলার জন্য আমি কয়েকটি প্রস্তাব পাঠালাম।
(১) ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট সিরিজ নিয়ে যদি খুব তাড়াতাড়ি একটি প্রচ্ছদকাহিনী প্রকাশ করেন তা হলে খুব ভাল হয়।
(২) 'আনন্দমেলা'য় আমার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে খেলোয়াড়দের রঙিন ছবি। আগামী কোনও সংখ্যায় মনোজ প্রভাকর, অজয় শর্মার রঙিন ছবি ছাপেন খুব ভাল হয়।
(৩) ক্রিকেট ও ফুটবল নিয়ে যদি আরও কিছু লেখা প্রকাশ করেন, তা হলে 'আনন্দমেলা' আরও জমজমাট হয়ে উঠবে।

সুব্রত সরকার লক্ষ্মীপুর বর্ধমান

আপনারা যদি আমার প্রিয় পত্রিকা 'আনন্দমেলা'য় ওয়াসিম আক্রম-এর একটি রঙিন পোস্টার ছাপান তা হলে খুব ভাল হয়।

ঝিমলি আচার্য
নবাবগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়
ইছাপুর, ২৪ পরগনা

'চেনা না-চেনা'র উত্তর

গত সংখ্যায় ছিল পুরনো দিনের কলকাতার কয়েকটি ফোটো। (ক) জেনারেল পোস্টঅফিস। (খ) সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রাল চার্চ। (গ) জোব চার্নকের সমাধি। (ঘ) হাইকোর্ট বিল্ডিং। (ঙ) পুরনো হাওড়া ব্রিজ। (চ) প্রিন্সেপঘাট।

রেডিও, টিভিতে

প্রিয় পত্রিকা 'আনন্দমেলা'য় ১৫ নভেম্বর সংখ্যায় 'কেরিয়ার গাইড' বিভাগে অমর দাশ কিশোর-কিশোরীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান 'বিদ্যার্থীদের জন্য' সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেননি। অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু লেখা হলে বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ হত।

বিপাশা নাথ যশোহর রোড, বনগ্রাম

সোনা-গিরির সোনার খনি

হারানো সোনার খনির খোঁজে বেরিয়েছিলেন নরসিংহন। সে এক রীতিমত অ্যাডভেঞ্চার। লিখেছেন **সঙ্কর্ষণ রায়**।

"সোনা-গিরি নেই বললে তো হবে না!" উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল আমার ভূতাত্ত্বিক সহকর্মী মন্নার স্বামিঘালা নরসিংহন (এম এস নরসিংহন)। দীর্ঘকাল ধরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সোনার সন্ধান নিচ্ছে বলে সে 'গোল্ড নরসিংহন' নামে খ্যাতি অর্জন করেছে। আমার সঙ্গে সিংভূম জেলার ধারা-গিরির কাছে মাকলিতে ক্যাম্প করে সে এদিককার লোপ পাওয়া সোনার খনির খোঁজ নিচ্ছে।

"ভ্যালেনটাইন বল্ তাঁর রিপোর্টে সোনা-গিরির কথা লিখেছিলেন।" নরসিংহন বলে চলে, "ধারা-গিরির কাছেই সোনা-গিরি। গোটা একটা পাহাড় তো একশো বছরের মধ্যে উবে যেতে পারে না। এদিকে খোঁজাখুঁজি করলে নিশ্চয়ই তার হদিস মিলবে।"

"বেশ তো, করো খোঁজাখুঁজি।" আমি বললাম।

ডেকে আনলাম আমার গাইড গুরা বান্দরাকে। তার মুখের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে নরসিংহন বললে, "ঠিক ঠিক জবাব দাও আমার প্রশ্নের। বলো সোনা-গিরি কোথায়?"

প্রশ্নটি শোনামাত্র একটু যেন চমকে উঠল গুরা। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, "জানি না সার। এ-তল্লাটে ধারা-গিরি আছে, আছে মাকলি, বাগাডেরা, কিন্তু সোনা-গিরি নামে কোনও পাহাড় নেই।"

"নিশ্চয়ই আছে। ভ্যালেনটাইন বল্ তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন যে, 'ধারা-গিরি পেরিয়ে গেলেই সোনা-গিরি। সোনা-গিরিতে খুব পুরনো সোনার খনি আছে। সেখান থেকে সোনা খনন করে বের করছে স্থানীয় আদিবাসীরা। আজ থেকে একশো বছর আগে ভ্যালেনটাইন বল্ দেখেছিলেন, খুব গোপনে খনি থেকে সোনা বের করে তারা একটা গুপ্ত গুহার মধ্যে জমাচ্ছে। আমি খবর পেয়েছি, খনিটা এখনও চালু আছে, ওখানকার আদিবাসীরা ওখান থেকে গোপনে সোনা বের করে ওই গুহার মধ্যেই জমিয়ে চলেছে।"

ধারা-গিরি পেরিয়ে গেলেই সোনা-গিরি। সোনা-গিরিতে খুব পুরনো সোনার খনি আছে। সেখান থেকে সোনা খনন করে বের করছে স্থানীয় আদিবাসীরা। আজ থেকে একশো বছর আগের ভ্যালেনটাইন বল্ দেখেছিলেন, খুব গোপনে খনি থেকে সোনা বের করে তারা একটা গুপ্ত গুহার মধ্যে জমাচ্ছে।

মৃদু হেসে গুরা বললে, "আপনি খবর পেলেও আমাদের কাছে কোনও খবর নেই। খবরটা কার কাছ থেকে পেয়েছেন জানতে পারি কি?"

"হ্যাঁ।" নরসিংহন জবাব দিল, "ঘাটশিলার রংকিনির মন্দিরের কাছে একজন অন্ধ বুড়ো থাকে, তার কাছ থেকে কিনেছি। মানে অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে ওই লোকটার কাছ থেকে পেয়েছি খবরটা।"

ঝলসে ওঠে গুরার চোখ দুটি। চাপা গলায় প্রায় ফিসফিসিয়ে সে বলল, "কত টাকা দিয়েছেন ওকে?"

"কত টাকা দিয়েছি তা শুনে কী করবে তুমি? তবে ওকে যা দিয়েছি, তার চেয়ে বেশি দেব তোমাকে যদি আমাদের ওই পাহাড়ি খনিটির কাছে নিয়ে যাও।"

"না, না।" শিউরে উঠল গুরা, "ওটা নিষিদ্ধ পাহাড়। ওখানকার কথা বিলেতের মানুষদের কাছে বলা যাবে না।"

"আমরা তো বিলেতের মানুষ নই।" নরসিংহন হেসে ফেলে বললে, "এ-দেশেরই মানুষ।"

"আমাদের এই বন-পাহাড়ের এলাকার বাইরের মানুষদের আমরা বিলেতের মানুষ বলে মনে করি।" গুরা গুরু-গম্ভীর গলায় বলল, "আমরা হো সম্প্রদায়ের মানুষ, সকলকেই আমরা বিদেশী বা বিলেতি বলে মনে করি, কারও সঙ্গেই কোনও সম্পর্ক নেই আমাদের। এক সময়ে বিলেত থেকে নুন ও চিনি ছাড়া কোনও জিনিসই আনতাম না এখানে।"

"ওই অন্ধ লোকটা নাকি নুনের সওদাগর ছিল।"

"জানি, চিনি ওকে। নুনের সওদাগর হয়ে সোনা-গিরির দিকে নজর দিতে গিয়েছিল। তার ফল কী হয়েছে তা তো স্বচক্ষেই দেখেছেন আপনি।"

এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ গুরার মুখের পানে

তাকিয়ে থেকে নরসিংহন বললে, "তুমি বলতে চাও যে, ওই সোনার খনির দিকে নজর দিলে আমাদেরও ওই রকম পরিণাম হতে পারে ?"

"হ্যাঁ সার।" গুরার গলার স্বর কেঁপে ওঠে, "আপনারা বিলেতি হলেও আপনাদের কোনও ক্ষতি হোক তা তো আমি চাই না। তাই বলছিলাম, সোনা-গিরি ছেড়ে যা করছিলেন তাই করতে থাকুন, সোনার বদলে তামা খুঁজুন, ম্যাঙ্গানিজ দেখুন।"

"সোনার বদলে তামা ! কী যে বলো তার ঠিক নেই !" অবজ্ঞার হাসি হাসল নরসিংহন, "সোনা ছাড়া আর কিছুর দিকেই নজর দিই না আমি। শোনো, আর কোনও কথা না বলে চলো আমাদের সঙ্গে। বিদেশী বা বিলেতিদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক তোমাদের না থাকলেও তাদের টাকাকে নিশ্চয়ই অবহেলা করতে পারবে না।"

বলে একটা একশো টাকার নোট গুরার হাতে গুঁজে দিল নরসিংহন।

"সোনা-গিরি ও খাদানে পৌঁছে আরও দেব।" নরসিংহন বলল, "এখন চলো।"

টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজতে-গুঁজতে গুরা বলল, "জায়গাটা তো আমার ঠিক জানা নেই..."

"জায়গাটা তোমার জানা নেই, তবু টাকাটা নিয়ে নিলে। ঝাঁঝালো স্বরে বলে উঠল নরসিংহন।"

"জায়গাটা চেনে আসাই কুই, বুধনি কুই, ফুলকি কুই..."

"আসাই কুই কে ?"

"গুরা এরা।" গুরুগম্ভীর গলায় জবাব দিল গুরা।

আমি বললাম, "গুরা এরা মানে গুরার স্ত্রী। বুধনি ও ফুলকি এ-গাঁয়ের অন্যান্য মহিলা। মনে হচ্ছে গাঁয়ের মহিলারা ওই পাহাড় ও খনির খবর রাখে।"

নরসিংহন বললে, "টাকাটা তা হলে আসাইকে দিয়ে আমাদের সোনা-গিরি নিয়ে যেতে বলো।"

"না, না !" গুরা শিউরে উঠল, "আসাইকে বলতে গেলে আসাই আমাকে মেরে ফেলবে। ওকে বা ওর সঙ্গিনীদের কাউকে কিছু না বলে ওদের পিছু নাও। খুব ভোরে ওরা যখন রওনা হবে, তখন আমি তোমাদের দুজনকে আমার ঘরের কাছে চিহোড়লতার ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখব। ওদের পেছনে পেছনে গা ঢাকা দিয়ে পা টিপে টিপে যেও তোমরা..."

পরদিন ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই নরসিংহন ও আমি গুরার ঘরের কাছে চিহোড়লতার ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘর মানে চেরা বাঁশ ও কাশ দিয়ে তৈরি ঝুপড়ি। বনের সঙ্গে মিশে আছে, বন থেকে তফাত করা কঠিন। গুরা আমাদের সঙ্গে এসেছিল, সে ফিসফিসিয়ে বলল, "আর-একটু বাদেই ওরা বেরিয়ে আসবে। খুব সাবধানে যেও ওদের পিছু পিছু, ওরা যদি টের পায় যে, তোমরা ওদের পিছু নিয়েছ, তোমাদের পেছনে ওরা হাতি লেলিয়ে দেবে।"

"হাতি !" নরসিংহনের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, "এর মধ্যে হাতির কী ভূমিকা ?"

"খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ হাতিই ওদের সাথী।"

খানিকক্ষণ পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল আসাই। এল বুধনি ও ফুলকি।

চলতে শুরু করে ওরা। ওদের অনুসরণ করি আমি এবং নরসিংহন।

ওদের পেছনে পেছনে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়ি আমরা। ওরা ছাড়া অন্য কোনও মানুষের পায়ের চিহ্ন বোধ হয় পড়েনি এখানে। বন এমনই অক্ষত যে, মনে হচ্ছে এখানে কাঠুরেরাও কাঠ কাটতে আসে না।

নরসিংহন ফিসফিসিয়ে বলল, "ওদের সঙ্গে কোনও হাতিকে তো দেখছি না !"

"না দেখলেও হাতি কাছেই আছে।" আমি বললাম।

"কী করে বুঝলে ?"

"বনের দিকে ভাল করে তাকাও। অস্পষ্ট পথ ফুটে উঠেছে বনের মধ্যে। হাতির পায়ে পায়ে এ-পথ তৈরি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

শাল, পিয়াশাল, গামার, অর্জুন, মহুয়া ইত্যাদি গাছের ফাঁকে ফাঁকে চিহোড়, বনপান, বনহলুদ প্রভৃতি লতাগাছ বনকে ঘন ও দুর্ভেদ্য করে তুলেছে। ওরা তিনজন যাচ্ছে বলেই যাচ্ছি আমরা, নইলে এই পথচলা অসম্ভব ব্যাপার।

এইভাবে ঘণ্টাখানেক যাওয়ার পর থেমে যাই, কারণ সামনে খাড়া পাহাড় এবং পাহাড় শুরু হতেই আসাই, বুধনি ও ফুলকিকে দেখা যাচ্ছে না। বনের মধ্যে কোথায় উধাও হয়েছে তারা তা বুঝতে পারছি না।

ওদের তিনজনকে দেখতে পাচ্ছি না বলে আমরা আর এগিয়ে যেতে পারছি না। পিছিয়ে যে আমাদের ক্যাম্পে ফিরে যাব তারও উপায় নেই, কারণ এখানে কোনও পথ ধরে আসিনি। ওদের তিনজনকে অনুসরণ করে এসেছি, কাজেই ওরা পথ না দেখালে ফিরে যেতে পারব না।

খুবই অসহায় বোধ করি আমরা। এখান থেকে উদ্ধার পাব কী করে ভাবতে গিয়ে দুজনেই দিশেহারা হয়ে পড়ি। যে করে হোক ওদের তিনজনকে খুঁজে বের করতেই হবে। পাহাড়ের গায়ে বনের মধ্যে খুঁজতে থাকি প্রাণপণ।

"আসাই, আসাই।" হঠাৎ চিৎকার করে ডেকে উঠলাম আমি।

"ও কী করছ তুমি !" ধমক দিয়ে উঠল নরসিংহন, "ওদের ডেকে এনে ওদের কাছে ধরা দিতে চাও। ওদের কাছে ধরা পড়লে আমাদের সর্বনাশ হবে যে !"

"তার চেয়েও বেশি সর্বনাশ হবে যদি আমরা এখানে পড়ে থাকি।" আমি বললাম।

আমার ডাক শুনতে পেয়েছিল ওরা। বনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আমাদের দুজনের সামনে এসে দাঁড়াল আসাই, বুধনি ও ফুলকি। দু'চোখে আগুন ছিটিয়ে আমাদের দুজনকে যেন ভস্ম করে ফেলতে চায় আসাই। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, "কে তোমরা ? কী মতলব নিয়ে পিছু নিয়েছ আমাদের ?"

"আমরা ভূতাত্ত্বিক, তোমরা যাদের পাথর-বাবু বলো।" নরসিংহন জবাব দিল, "আমরা সোনা-গিরি যেতে চাই।"

"এই তো সোনা-গিরি। সোনা-গিরিতে কী খুঁজতে এসেছ তোমরা ?"

"সোনা। তোমাদের কাছ থেকেই তার হদিস পেতে চাই। শুনেছি, তোমরা খনি থেকে সোনা বের করে একটা গুহার মধ্যে জমাচ্ছ..."

খিলখিল করে হেসে উঠল আসাই, বুধনি

ও ফুলকি।

অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে আসাই বললে, "সোনার ওপরে তোমাদের বড় লোভ দেখছি। এসো আমাদের সঙ্গে।"

বনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে থাকে ওরা তিনজন। আমরা ওদের অনুসরণ করে চড়াই বেয়ে উঠতে থাকি।

ওদের পেছনে পেছনে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়ি আমরা। ওরা ছাড়া অন্য কোনও মানুষের পায়ের চিহ্ন বোধ হয় পড়েনি এখানে। বন এমনই অক্ষত যে, মনে হচ্ছে এখানে কাঠুরেরাও কাঠ কাটতে আসে না।

দুর্ভেদ্য বনকে ভেদ করেছে একটি সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়াল ওরা তিনজন।

আসাই বললে, "এটা একটা পুরনো খনির সুড়ঙ্গ। হয়তো সোনা-গিরির সোনার খনি। আমরা আমাদের সোনা কুড়িয়ে এনে জমাচ্ছি এখানে। এই দ্যাখো..."

বলে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে আসাই যা বের করে আনল, তা দেখে আমাদের চক্ষুস্থির। মাটি-মাখানো বুনো আলু।

"এই আমাদের সোনা। এই বনের মধ্যে ফলে। আমরা কুড়িয়ে এনে জমাই এখানে। একে বলে তুন্দা। তুন্দা শুকিয়ে পিষে ফেলি আমরা। তুন্দার আটা দিয়ে রুটি তৈরি করি। খুব মিষ্টি রুটি। চাও তো এর নমুনা তুলে নিতে পারো।"

নরসিংহন বললে, "সামান্য এই বুনো আলু নিয়ে এত বাড়াবাড়ি ও লুকোচুরি করছ কেন তোমরা জানতে পারি?"

"সামান্য কাকে বলছ!" আসাই বললে, "আমাদের কাছে সোনার চেয়েও দামি। এ-তল্লাটের আর কোথাও হয় না। এর খবর পেলে আশপাশের গাঁ থেকে সাঁওতাল ও মুণ্ডারা এসে লুটপাট করে নিয়ে যাবে। সাবধান এর খবর কেউই যেন না পায়!"

নরসিংহন মৃদু হেসে বলল, "ভয় নেই, তোমাদের এই সোনার ওপরে বিন্দুমাত্রও লোভ নেই আমাদের। আমরা চাই আসল সোনা..."

"তোমাদের আসল সোনার খবর আমরা রাখি না। আমরা চলি..."

বলে তারা চলে গেল।

"ওরা চলে গেল যে।" আমি আর্তকণ্ঠে বলে উঠলাম।

"যাক না।" তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল নরসিংহন, "এসো, আমরা আমাদের কাজ করি।"

কিন্তু সুড়ঙ্গের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াল নরসিংহন। খানিকক্ষণ এক দৃষ্টে সুড়ঙ্গের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলল, "আমাদের সঙ্গে টর্চ নেই, অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকতে হলে সুড়ঙ্গের মুখে আগুন জ্বালাতে হবে।"

"না।" আমি বললাম, "আগুন জ্বেলে সুড়ঙ্গের মধ্য থেকে বুনো শুয়োর বা ভালুককে টেনে আনব আমরা, আগুন দেখে অজগরও তেড়ে আসতে পারে।"

"ঠিক বলেছ। আপাতত চলো ফিরে যাই আমরা এখান থেকে। পরে টর্চ, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা যাবে।"

"কিন্তু ফিরে যে যাব, তার পথ কই! আসাই বা তার সঙ্গিনীরা আমাদের পথ দেখিয়ে না নিয়ে গেলে এক পাও কি যেতে পারব আমরা!"

"চেষ্টা করা যাক।" নরসিংহন গম্ভীর মুখে বলল।

কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা ব্যর্থ হই।

আমি চিৎকার করে ডাকলাম, "আসাই, আসাই..."

আমার কাতর ডাক শুনে আসাই বা তার সঙ্গিনীরা কোনও সাড়া দেয় না। কিন্তু সাড়া জাগে বুনো হাতিদের মধ্যে। সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে তারা।

তারপর আলোড়ন শুরু হয় আমাদের চারপাশে বনের মধ্যে। বন ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে দশ-বারোটি বড় আকারের হাতি। তারা ঘিরে ফেলে আমাদের।

হাতিদের মধ্যে চারটি ছিল দাঁতালো। আটটা ঝকঝকে ছুঁচলো দাঁতের মধ্যে বন্য হাতিদের সমবেত হিংস্রতা যেন প্রকাশ পায়।

রুদ্ধশ্বাসে চূড়ান্ত আঘাতের জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময় ঘটে যায় একটা অদ্ভুত ব্যাপার। হিংস্র দাঁতালো হাতিদের দল থেকে হঠাৎ এগিয়ে আসে একটি দাঁতহীন হাতি। দাঁতালো হাতিগুলো পুরুষ, এই ফোকলা হাতিটি স্ত্রী-হাতি। ফোকলা মানে অবশ্য পুরোপুরি ফোকলা নয়, মুখের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে সাধারণ দু' পাটি দাঁত।

স্ত্রী-হাতি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং আমাদের দুজনের সর্বাঙ্গে শুঁড় বোলাতে থাকে। সঙ্গে-সঙ্গে আর সব হাতিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং উধাও হয়ে যায় বনের মধ্যে।

একদৃষ্টে খানিকক্ষণ হস্তিনীর দিকে তাকিয়ে থেকে নরসিংহন বলল, "আমার কী মনে হচ্ছে জানো, আমার মনে হচ্ছে এ যেন আমাদের সাহায্য করতে চায়।"

"কী করে বুঝলে?" আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"ওর হাবভাব দেখে। ভাল করে লক্ষ করলে তুমিও বুঝতে পারবে..."

খানিকক্ষণ বাদে শুঁড় তুলে কী যেন ইশারা করে হস্তিনীটা, তারপর চলতে শুরু করে দেয়।

"চলো, ওর পেছনে পেছনে আমরাও চলি।" চাপা উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠে নরসিংহন, "ওকে অনুসরণ করে এখান থেকে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারব..."

সত্যিই তাই। হস্তিনীটিকে অনুসরণ করে আমরা গভীর বন পেরিয়ে যাই, নেমে আসি সোনা-গিরি থেকে।

বাসাডেরার রাস্তা পর্যন্ত আমাদের পৌঁছিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে হস্তিনীটা। তার শুঁড়ে হাত বোলাতে বোলাতে নরসিংহন বলল, "মনে হচ্ছে এর সাহায্যেই সোনা-গিরির সোনার খনিকে পুনরুদ্ধার করতে পারব।"

টাকাকড়ি

টাকার জন্ম : প্রথম পর্ব

টাকা বা মুদ্রা ইতিহাসের দিক থেকেও মূল্যবান।
লিখেছেন **ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**।

কেনাকাটার ব্যাপারে রোজ আমাদের টাকার দরকার পড়ে, টাকা না থাকলে সংসার অচল। টাকা বলতে অবশ্য আমরা এখন শুধু ছবি ও লেখ (inscription) সমেত ধাতুর খণ্ডই বোঝাই না, সরকারিভাবে প্রচারিত নোটকেও সাধারণভাবে টাকা বলেই মনে করি। যেমন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নাম লেখা কাগজের দু' টাকা মূল্যের নোটকে আমরা ধাতুর দু' টাকার মতোই ব্যবহার করি। নোটের প্রচলনের আগে কেনাবেচার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত টাকা ছিল কেবলমাত্র ছবি ও (অথবা) লেখসমেত নির্দিষ্ট ওজনের ধাতুখণ্ড।

এই ধাতুর খণ্ডগুলি নির্দিষ্ট ওজনের এবং কোনও বিশেষ কর্তৃপক্ষ বা শাসকশ্রেণী দ্বারা প্রচলিত। টাকার উপরে কোনও বিশ্বাসযোগ্য কর্তৃপক্ষের ছাপ থাকলে তার প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগে না, এমনকী, এই মূল্য নির্দিষ্ট মূল্যের চেয়ে কিছু কম হলেও লোকে তা গ্রহণ করে। বারবার ওজন করে বা পরীক্ষা করে তার মূল্য যাচাই করতে হয় না। এইখানেই নির্দিষ্ট ওজনের কোনও ধাতব খণ্ডের থেকে কোনও কর্তৃপক্ষের ছাপ মারা টাকার তফাত।

টাকা আবার শুধু বিনিময়ের মাধ্যমই নয়। টাকার উপরে খোদাই করা লেখ'র সঙ্গে কখনও রাজার কখনও শাসকের আবার কখনও বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিমূর্তি থাকে। এ ছাড়াও অনেক সময় টাকার উপরে দেবদেবী ও নানা বিষয়ের ছবি থাকে। এইগুলি সমসাময়িক রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসের নানারকম সংবাদের ইঙ্গিত দেয়।

টাকার উপর উৎকীর্ণ সুন্দর-সুন্দর ছবিগুলি সমকালীন শিল্পকলার উন্নত মানের ইঙ্গিত করে। কেবলমাত্র আধুনিক কালেই নয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগেও অনেক উৎকৃষ্ট মানের টাকা তৈরি হয়েছিল যেগুলির উপরে উৎকীর্ণ চিত্র এতই চমৎকার যে, ওইগুলি প্রথম শ্রেণীর চারুকলার নিদর্শন বলে স্বীকৃত। আমরা এই প্রসঙ্গে প্রাচীন হেলেনীয় ও হেলেনায়িত রাজ্যগুলির মুদ্রা এবং ভারতের কুষাণ, গুপ্ত ও মোগল যুগের মুদ্রাব উল্লেখ করতে পারি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে কোনও যুগের টাকা বা মুদ্রা শুধুমাত্র সেই সময়ের বিনিময়-মাধ্যমই নয়, সঙ্গে-সঙ্গে সেই যুগের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতিবিম্বও বটে। টাকার মূল্য তাই মানবসভ্যতার ইতিহাসে অপরিসীম।

মানুষের সঙ্গে টাকার পরিচয় কিন্তু সভ্যতা বিকাশের অনেক পরে। তাও আবার কতকগুলি অর্থনৈতিক বিবর্তনের স্তর পেরিয়ে। আজ আমরা টাকা ছাড়া জীবন ভাবতেই পারি না, কিন্তু এই ভারতীয় উপমহাদেশে আড়াই হাজার বছর বা তার কিছু আগে কেউ টাকার কথা জানতই না।

তা হলে টাকাহীন যুগে কীভাবে কেনাবেচা চলত? মানুষ যখন সমাজবদ্ধভাবে নানা অঞ্চলে বসবাস শুরু করে এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয়, তখন আর কারও পক্ষে তার প্রয়োজনীয় সব জিনিস নিজে তৈরি করে নেওয়া সম্ভবপর হত না ; তাকে নির্ভর করতে হত অন্যের উপরে। কিন্তু তার পছন্দমতো দ্রব্যের প্রস্তুতকারক বা সরবরাহকারী বিনিময়ে কিছু না নিয়েই তাকে নিয়মিতভাবে খুশিমনে তা দেবে কেন? অবশ্য এই সমস্যা সমাধানের একটা উপায়ও ছিল। সংশ্লিষ্ট দুজনের কাছে যদি এমন-এমন দ্রব্য থাকত যাতে একজনের দ্রব্য অন্যজনের প্রয়োজন মেটাতে পারে, তা হলে দুজনের প্রত্যেকের পক্ষে একের পছন্দসই জিনিস অন্যের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভবপর ছিল। অর্থাৎ এইভাবে একের দ্রব্য অন্যের হাতে যেত। এইভাবে দেওয়া-নেওয়ার রীতিকে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বলা যেতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে বিনিময়যোগ্য দ্রব্য দুটির আপাতমূল্য মোটামুটিভাবে এক হতে হবে, কারণ খুব বেশি দামের জিনিসের সঙ্গে খুব কম দামের জিনিসের বিনিময় বারবার নিশ্চয় সম্ভবপর নয়।

অনুমান করা যাক যে, রামের কাছে একটা বাড়তি কম্বল আছে, কিন্তু তার দরকার একটি লেপ। অন্যদিকে শ্যামের কাছে একটা অতিরিক্ত লেপ থাকলেও তার প্রয়োজন একটা কম্বলের। এই ক্ষেত্রে দ্রব্য দুটি বিনিময়ের কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যদি শ্যামের কম্বলের দরকার না থাকে, তা হলে রাম কী করবে? তখন তো আর তাদের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় সম্ভবপর নয়।

সামাজিক মানুষের এই প্রাথমিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান নানা দেশে বিভিন্ন সময় হয়েছিল। যেসব ভূখণ্ডে প্রাচীনকালে মানুষ সভ্যতার উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল (যেমন ইজিপ্ট, পশ্চিম এশিয়া, গ্রিস, ইরান, ভারত, চিন প্রভৃতি অঞ্চল) সেখানে এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল

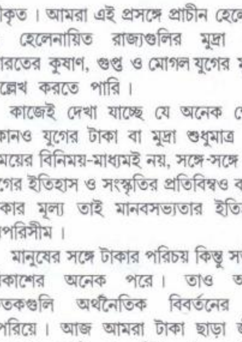

মুদ্রায় ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতিবিম্ব ঘটে। এক প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রায় মহাবীর আলেকজান্ডারের মাথার ছবি পাওয়া গিয়েছে।

কুষাণ যুগের স্বর্ণ মুদ্রা

গুপ্ত যুগের স্বর্ণ মুদ্রা

এক কুষাণ স্বর্ণ মুদ্রার মুখাদিকে রাজা বিম কদফিসের প্রতিমূর্তি

মোগল যুগের স্বর্ণ মুদ্রা

নিত্য প্রয়োজনীয় কোনও জিনিস বা সকলের কাম্য কোনও মূল্যবান দ্রব্যকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে শস্য, গবাদি পশু এবং সোনা বা রুপার মতো মূল্যবান ধাতুর উল্লেখ করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট সংখ্যার বা ওজনের দ্রব্য বিনিময়ের একক হিসাবে ধরা হত। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর অংশে গোরু 'ধন' হিসাবে অভিহিত হত। অবশ্য কেউ নিশ্চয় অল্প মূল্যের জিনিস গোরু দিয়ে কিনতে চাইত না। কিন্তু শস্যকে স্বল্প মূল্যের এককে ভাগ করা সম্ভবপর ছিল। অবশ্য এক লোকালয় থেকে অন্য লোকালয়ে কেনাকাটা করতে গেলে সঙ্গে বহু পরিমাণ শস্য নিয়ে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধার কারণ হয়ে দেখা দিত।

প্রাচীন গ্রিসে লোহার পাত ও লোহার শিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত। এর মধ্যে বিশেষ করে লোহার পাতগুলি নিয়ে ঘোরাফেরা করা ভীষণ কষ্টকর ছিল। পরবর্তীকালে প্লুটার্ক আক্ষেপ করে লিখেছিলেন যে, "পাতগুলি ছিল অত্যন্ত ভারী এবং নিয়ে চলাফেরা করার পক্ষে অসুবিধাজনক। এ ছাড়া অনেক পরিমাণ ও ওজনের লোহার সত্যকারের (ক্রয়) মূল্য ছিল সামান্য।" একটু বেশি পরিমাণের লোহা রাখতে হলে বাড়িতে "একটি বড় ভাঁড়ার ঘরের প্রয়োজন হত, পাতগুলি সঙ্গে নিয়ে যেতে হলে দরকার পড়ত গবাদি পশুবাহিত শকটের।" (লাইকারগুস, ৯)। অন্যদিকে কাউকে এই ধরনের অসুবিধা ভোগ করতে হত না যদি সঙ্গে থাকত বহুমূল্যের সোনা বা রুপার পিণ্ড বা গহনা যা অল্প পরিমাণে নিয়ে গিয়ে অনেক জিনিস কেনা যেত।

সোনা বা রুপা দিয়ে কেনাবেচা করার অনেক উদাহরণ আমাদের জানা আছে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার (যা আজ ইরাকের সীমানার মধ্যে) কয়েকটি শহরের ধ্বংসস্তূপে উৎখননের কালে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ের বেশ কয়েকটি ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে পাওয়া গেছে নির্দিষ্ট ওজনে কাটা-রুপা ছোট ছোট খণ্ড ও কাটা-গহনা। প্রাচীন নিপ্পুর শহরের ধ্বংসাবশেষে পাওয়া কিছু মাটির ফলকে উৎকীর্ণ লেখ থেকে জানা যায় যে, দাম দেওয়ার বা ধার শোধের জন্য কোনও-কোনও ক্ষেত্রে শস্য ও গবাদি পশু ব্যবহৃত হলেও বেশিরভাগ সময় শেকেল ওজনের মার্গে কাটা-রুপা ব্যবহার করা হত। মান অনুযায়ী এক শেকেলের ওজন ছিল ৩৩৬ গ্রেন। এখানে উল্লেখ্য যে, 'শেকেল' কথাটির উৎপত্তি 'শকল' থেকে। যার আক্ষরিক অর্থ 'ওজন করা'।

(ক্রমশ)

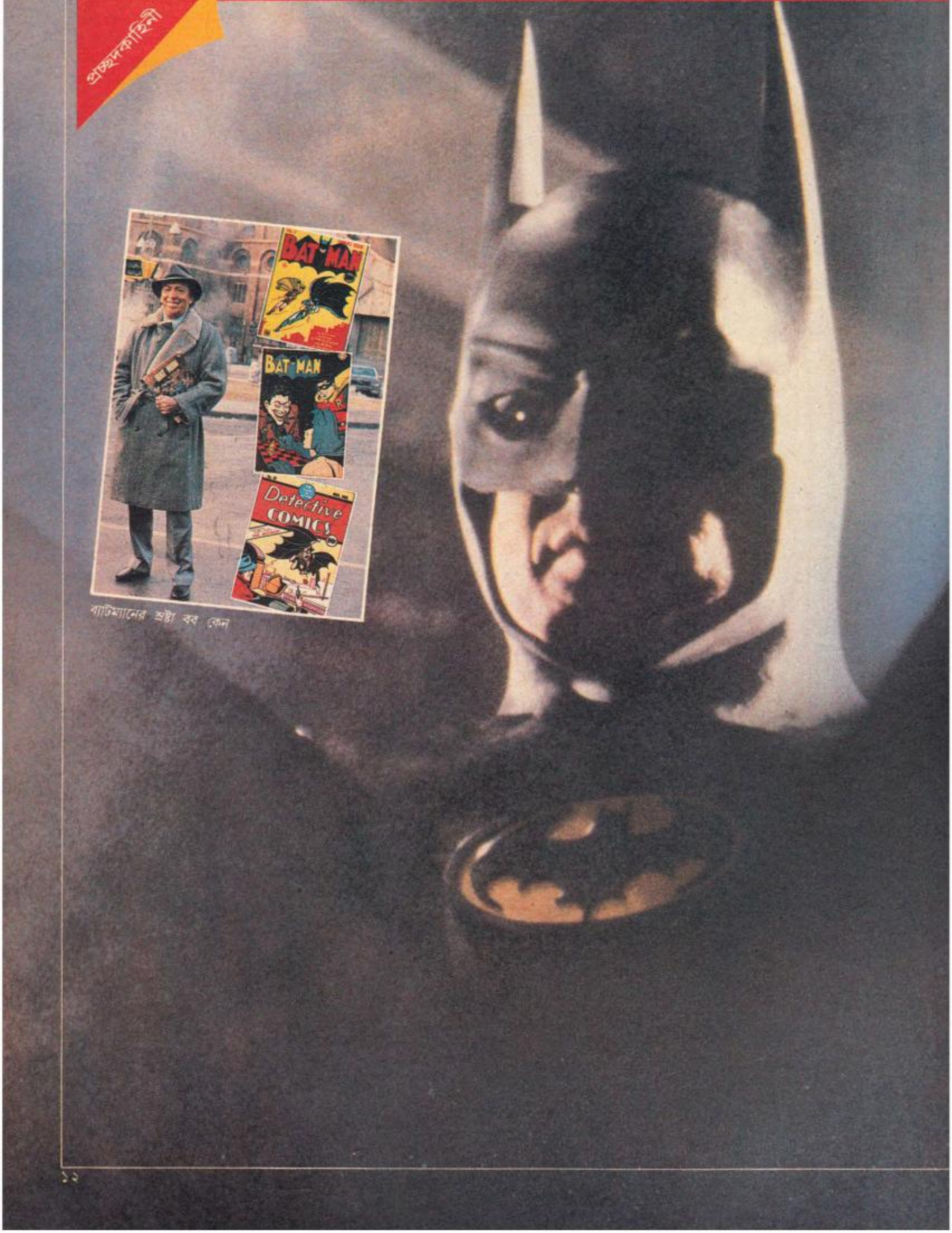

ব্যাটম্যানের স্রষ্টা বব কেন

সু পা র হি রো

ব্যাটম্যান

কে এই ব্যাটম্যান, যাকে নিয়ে সারা দুনিয়া তোলপাড় ?
আলোচনা করেছেন সুভাষ চক্রবর্তী ও গৌতম চক্রবর্তী ।

ছবি আঁকতে ভালবাসতেন বব কেন । ভিন্ন স্বাদের ছবি । রং-তুলির বদলে ব্যবহার করতেন কলম । অনেকটা খ্যাতনামা চিত্রকর সালভাদোর দালি-র ভাবধারায় গড়া নানা চরিত্র ও ভাবের বিন্যাস প্রকাশ পেত তাঁর প্রতিটি ছবিতে । একদিন হঠাৎ কোনও পূর্বপরিকল্পিত চেষ্টা ছাড়াই নতুন একটি চরিত্রের আনুমানিক খসড়া তৈরি করলেন তিনি । হাতের জাদুতে তৈরি হল আজব এক মানুষ । কালো মুখোশের আড়ালে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চোখ । সুঠাম পেশীবহুল চেহারা । পোশাক পরিচ্ছদে কেমন যেন অদ্ভুতুড়ে ছাপ । হঠাৎ দেখলে অর্ধেক বাদুড় আর অর্ধেক মানুষ বলে ভ্রম হয় । কিছুটা অতিমানুষের ভাবধারায় বাঁধতে চেয়েছিলেন বব নিজের সৃষ্ট এই চরিত্রটিকে । চেয়েছিলেন কার্টুন ও কমিকস-দুনিয়ার এক নয়া সুপারহিরোর জন্ম দিতে । দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করাই হবে যার প্রধান কাজ । কল্পবিজ্ঞানের ছায়ায় বব গড়েছিলেন এক মহা শক্তিমান প্রবাদপুরুষ । একই মানুষকে দুটি ভিন্ন পরিচয়ে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন তিনি । তাই গড়েছিলেন 'ব্রুস ওয়েন' ও 'ব্যাটম্যান'-কে ; ঠিক জেরোম সিগাল যেভাবে গড়েছিলেন 'ক্লার্ক কেন্ট' বা 'সুপারম্যানকে' ।

গথাম শহরের এক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত নাগরিক ব্রুস ওয়েন অন্ধকার রাত্রে হয়ে যান ব্যাটম্যান । ব্যর্থ হয় গথাম শহরের সূক্ষ্মবুদ্ধি অপরাধীদের পরিকল্পিত প্রয়াস। শহরের বাসিন্দারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে । খবরের কাগজের শিরোনামে বারে বারে একটি নামই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ব্যাটম্যান ।

কে এই ব্যাটম্যান, যাকে নিয়ে এত কমিক স্ট্রিপ, এত মাতামাতি ! কেন শুধু ব্যাটম্যান নামটাই এমন রহস্যময় হয়ে ওঠে আমাদের কাছে ? কোন ক্ষমতার বলে ব্রুস ওয়েন অন্ধকার রাত্রে হয়ে ওঠেন ব্যাটম্যান ! এই বিখ্যাত চরিত্রটির স্রষ্টা বব কেন এরকম অজস্র প্রশ্নের

জোকার

প্রতিটি দৃশ্যই বেশ ভেবেচিন্তে তৈরি করা হয়

ব্যাটম্যানের ছবি ও কমিক্স সবই ঘটনাবহুল।

জবাব দিয়েছেন 'ব্যাটম্যান' নামের কমিকস বইতে।

কমিকস বইয়ের আকারে ব্যাটম্যান প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩৯ সালে। রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে যায় চরিত্রটি। এগিয়ে আসেন 'ওয়ারনার ব্রাদার্স'-এর কর্মকর্তারা। ওয়ারনার ও হ্যানা বারবার-র যুগ্ম উদ্যোগে কার্টুন ছবি হিসেবে আমেরিকার টিভিতে আত্মপ্রকাশ করে ব্যাটম্যান ১৯৪০ সালের শুরুতে। আবার জনপ্রিয়তা। দু-একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের সাহায্য নিয়ে তিনি নিয়মিত প্রকাশ করতে থাকেন ব্যাটম্যানের গল্প। কখনও ব্যাটম্যানের সংঘর্ষ হয় কুটিল বুদ্ধি পেঙ্গুইন-এর সঙ্গে। বহুতল বাড়ির ছাদে কখনও - বা মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ করেন 'রিড্‌লার'কে। আবার মাঝে-মাঝে 'ক্যাট-উওম্যান'-এর হিংস্র থাবার হাত থেকে বাঁচতে তাঁকে মরিয়া হয়ে লড়তেও দেখা যায়। এরকম আরও অজস্র ছোট-বড় গল্পের সমন্বয়ে তৈরি হয় ব্যাটম্যান শীর্ষক ডি সি কমিক্স বইয়ের পাতাগুলি।

১৯৬০ সাল অবধি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিল বব কেনের সৃষ্ট চরিত্রগুলি। তারপর একে একে এসে যায় 'সুপারম্যান', 'স্পাইডারম্যান', 'এক্সম্যান', 'পানিশার', 'হি-ম্যান' এবং 'টিন এজ মিউট্যান্ট নিন্‌জা টারটেল্‌স'। এ ছাড়াও 'আর্চি', 'জি আই জি ও', এবং আরও অজস্র কমিকস বইয়ের ভিড়ে হারিয়ে যায় 'ব্যাটম্যান'। বব কেনই শুধু নন, ব্যাট-বইগুলির প্রকাশক ডি সি কমিক্স-এর কর্মকর্তারাও সমস্যায় পড়ে যান। হঠাৎই ববের মাথায় এক নতুন চিন্তা

এই জোকার হাসে ভয়ও দেখায়

জোকার। নামটা শুনলেই গথাম শহরের বাসিন্দারা ভয়ে শিউরে ওঠেন। জোকার। পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর হওয়া যার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। দেশের অপরাধীদের মধ্যে ব্যাটম্যান যাকে সবচেয়ে ঘৃণা করে সেই জোকার।

কমিক্স বইয়ের পাতায় জোকারকে আনা হয়েছিল চল্লিশ দশকের শেষের দিকে। মাফিয়া চক্রের গডফাদার কার্ল গ্রিসন-এর ডান হাত এই জোকার। একেবারে শুরুর দিকে জ্যাক ন্যাপিয়ার নামে পরিচিত ছিল সে। কোনও এক কারণে গ্রিসনের সঙ্গে একবার তীব্র মতবিরোধ হয় জ্যাকের। জ্যাককে খতম করতে চায় গ্রিসন। অ্যাকসিস কেমিকাল প্লান্ট-এর একবার জ্যাককে কিছু জরুরি কাগজপত্র চুরি করার দায়িত্ব দেয় গ্রিসন। এদিকে পুলিশ কমিশনার গর্ডনকে

আসে। ব্যাটম্যান কমিক্স বইয়ের স্কেচগুলি আরও উন্নত মানের করে তোলেন তিনি। রঙের ব্যবহারও অনেক ভেবেচিন্তে করা হয়। ফলে ব্যাটম্যান কমিক্সগুলি আর শুধুমাত্র কমিক্স থাকে না, হয়ে ওঠে গ্রাফিক নভেলস।

নতুনভাবে চাহিদা বাড়তে থাকে ব্যাটম্যানের। এই সময় বব ভাগে ভাগে ব্যাটম্যানের জীবনের নানা টানাপোড়েনের ঘটনাগুলিকে ধারাবাহিকভাবে পরিবেশন করেন দর্শকদের কাছে। 'দ্য কিলিং জোক' গল্পে বলা হয়, কেন 'জোকার' ব্যাটম্যানের চিরশত্রু। 'এ ডেথ ইন দ্য ফ্যামিলি' গল্পে জানা যায় কিশোর ব্যাটম্যানকে কীভাবে নানা বিপদের বেড়াজালে একাধিকবার জড়িয়ে ফেলে 'জোকার'। 'সন অব ডেমন' গল্পে হঠাৎই ব্যাটম্যানের প্রিয় বন্ধু রবিন নৃসংশভাবে খুন হয়। আবারও ভেসে ওঠে জোকারের মুখে এক কুটিল হাসি। 'দ্য ডার্ক নাইট রিটার্নস' গল্পে চিত্রায়িত করা হয় ব্যাটম্যান তৈরির ইতিহাস।

এই বইগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর ব্যাটম্যানের জনপ্রিয়তা আবার আকাশছোঁয়া হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময় ওয়ারনার ব্রাদারস-এর কর্তৃপক্ষ ব্যাটম্যানকে নিয়ে একটি ফিচার-ছবি তৈরির কথা ভাবেন। ১৯৪০ সাল নাগাদ কার্টুন ছবির আকারে টিভিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ব্যাটম্যান। তারপর ১৯৬৩ সালে প্রথম তৈরি হয় ব্যাটম্যান বিষয়ক ফিচার ছবি। অ্যাডাম ওয়েস্টকে ব্যাটম্যানের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায় ছবিটিতে। সিজার রোমেরো 'জোকার' চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু তেমনভাবে সফল হয় না ছবিটি।

ব্যাটম্যান বিষয়ক সর্বাধুনিক ছবিটিতে দেখানো হয়েছে কীভাবে খুনি জ্যাক ন্যাপিয়ার হয়ে ওঠে জোকার। কীভাবে স্মাইলেক্স গ্যাস দিয়ে গথাম শহরের বাসিন্দাদের চিরকালের জন্যে ঘুম পাড়াতে চেয়েছিল এই শয়তান! আমেরিকান ডলারের প্রতিটি নোটে নিজের ছবি ছাপাতে চেয়েছিল। কিন্তু আবারও ব্যাটম্যান ঘটনাচক্রে জোকারের সব প্রয়াস বানচাল করে দেয়।

টিম বার্টন পরিচালিত ব্যাটম্যান ছবিটি ইতিমধ্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বিদেশে। জোকার-এর ভূমিকায় অভিনেতা জ্যাক নিকলসন কুড়িয়েছেন ভূয়সী প্রশংসা। ব্যাটম্যান ও ব্রুস ওয়েন-এর ভূমিকায়

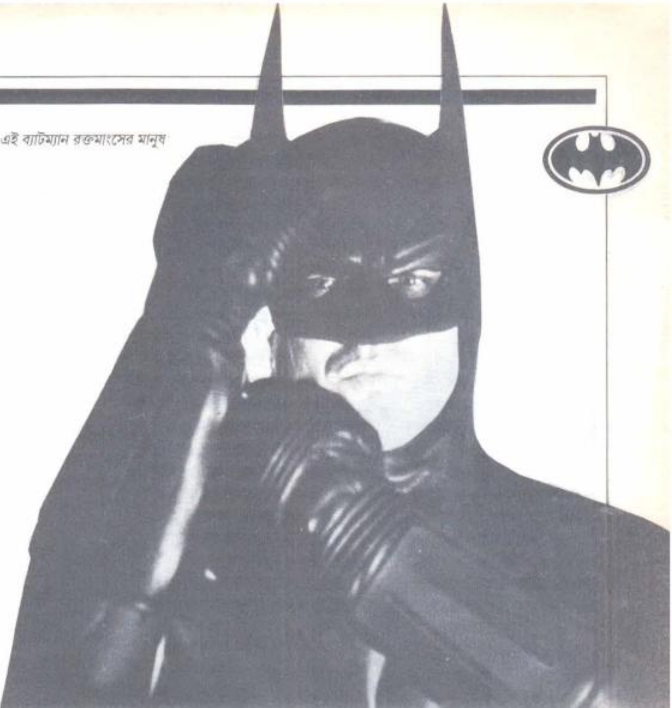

এই ব্যাটম্যান রক্তমাংসের মানুষ

জ্যাকের গতিবিধির কথা ফাঁস করে মোটা টাকা সে ঘুষ দিয়ে রাখে। জ্যাক ন্যাপিয়ার কিছু বুঝে ওঠার আগেই ফাঁদে ধরা পড়ে। এদিকে অ্যাকসিস কেমিকালে জ্যাক যখন পুলিশের মোকাবিলায় ব্যস্ত, তখন হঠাৎই ব্যাটম্যান এসে জ্যাক'কে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানান। জ্যাক গুলি করে। গুলি ব্যাটম্যানের চাদরে লেগে ফিরে যায় ওর দিকে। ভারসাম্য হারিয়ে জ্যাক পড়ে যায় অ্যাসিড ভর্তি বিরাট একটি পাত্রে। সবাই ভেবেছিল জ্যাক মারা গেছে। কিন্তু আসলে সে মারা যায়নি। ম্যানহোল এবং নালা বেয়ে সমুদ্রে পড়ে কেমিকাল প্লান্ট-এর জঞ্জাল। রাতের অন্ধকারে আচমকা মাথাচাড়া দেয় এক সবুজ চুলওয়ালা সাদা হাস্যময় শয়তান। তার জীবনের লক্ষ্য ঘুমপাড়ানি স্মাইলেক্স গ্যাসের ধোঁয়ায় সারা পৃথিবীর ঘুম পাড়িয়ে বিশ্বের একমাত্র অধিকর্তা হওয়া। ওর একমাত্র শত্রু— ব্যাটম্যান। ওর নয়া নাম—জোকার!

কঠিন, কঠোর ব্যাটম্যানের কাছে জব্দ সব অপরাধী

ব্রুস ওয়েন কী করে হলেন ব্যাটম্যান

গথাম শহরের একটি সিনেমা হল থেকে ছবি দেখে বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছিলেন কিশোর ব্রুস ওয়েন, এবং তাঁর মা-বাবা। রাতের অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন তাঁরা। সুযোগ বুঝে খুনে গুণ্ডারা অতর্কিতে আক্রমণ করে তাঁদের। বাঁধা দিতে গেলে গুণ্ডাদলের সর্দার 'রাস এল গুল'-এর হাতে ব্রুস-এর বাবা নিহত হন। পুরো ঘটনাটা কিশোর ব্রুস-এর মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে ওঠেন। নিয়মিত ব্যায়াম ও শরীরচর্চা শুরু করেন। দিন কয়েকের মধ্যেই মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ এবং আচমকা আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্যে বহু কৌশল ও ফন্দিফিকির শিখে ফেলেন তিনি। একই সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ক নানা বইপত্র পড়েও নিজের জ্ঞান বাড়িয়ে তোলেন। অবশেষে একদিন বেশ কিছু নতুন অস্ত্র আবিষ্কার করেন ব্রুস। পরবর্তীকালে কমিক বইয়ের পাতায় এগুলিকে বলা হয় 'ব্যাটগান', 'ব্যাটিনজা চক্র', 'ব্যাটশুটার' এবং 'ব্যাটার‍্যাং'। নিজেকে নানা বিষয়ে পারদর্শী করার সঙ্গে-সঙ্গে আরও একটি ফন্দি এঁটেছিলেন ব্রুস। নিজেকে অতিমানুষ-এর ভাবধারায় গড়তে চেয়েছিলেন। নিজের চেহারায় আনতে চেয়েছিলেন পোশাকি পরিবর্তন। নিজের ভেতরে প্রতিশোধের আগুনে ঝলসে-ওঠা মানুষটিকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বহু ভাবনা-চিন্তার পরেও সেভাবে কিছু ভেবে উঠতে পারেননি তিনি। এর পর হঠাৎই একদিন সন্ধেবেলায় আলো জ্বালতে গিয়ে ব্রুস তাঁর স্টাডিরুমের জানলার বাইরে হঠাৎ কিছু বাদুড় উড়তে দেখেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ঠিক করে ফেলেন নিজের দ্বিতীয় পরিচয়। কিছুদিন পরের কথা। গথাম শহরের বাসিন্দারা এক নতুন সুপারহিরো'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। কালো চাদর আধা-মুখোশ এবং কালো

'ব্যাটকেভ' : গুহার অন্ধকারে ঘটে রোমাঞ্চকর নানা ঘটনা

মাইকেল কিটন এবং সাংবাদিক ভিকি ভেল-এর ভূমিকায় কিম ব্যাসিনজারও বাহবা পেয়েছেন। এরই মধ্যে একটি রেকর্ড কম্পানির দৌলতে ব্যাটম্যান ছবির গানগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এ-দেশে। রক গায়ক 'প্রিন্স'-এর গাওয়া 'ব্যাটড্যান্স' গানটি এখন অনেকেরই মুখে মুখে। ব্যাটম্যান ছবিটির পরিবেশক জানিয়েছেন যে, ব্যাটম্যান-এর দেখা মিলবে কলকাতায়। ব্যাটমোবিল (ব্যাটম্যানের গাড়ি) ও ব্যাটার‍্যাম (ওঁর ইউটিলিটি বেল্ট) নিয়ে ব্যাটম্যান শিগগিরই কলকাতার একটি হলে ঢুকে পড়বে।

এখানে বলে রাখা ভাল, কমিক বইয়ের বিখ্যাত কয়েকটি চরিত্রের বয়স ইতিমধ্যেই পঞ্চাশ অতিক্রম করে গেছে। এঁরা হলেন মিকি, টিনটিন, সুপারম্যান আর ব্যাটম্যান।

কালো বাদুড়ের ডানা

সুপারম্যান ও ব্যাটম্যানের বয়সের পার্থক্য খুব একটা বেশি নয়, মাত্র এগারো মাস। ১৯৩৮ সালের জুন মাসে, ১৭ বছরের মার্কিন বালক জেরোম সিগাল ও তার বন্ধু জো শাস্টার একটি চরিত্র সৃষ্টি করে। অ্যাকশন কমিক্‌সের প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে দেখা গেল, নীল রঙের পোশাক পরে, গলায় লাল কাপড় উড়িয়ে সিগাল ও শাস্টারের আঁকা চরিত্রটি দু'হাতে একটা মোটরগাড়ি মাথার ওপর তুলে ধরেছে। এই চরিত্রটির নাম সুপারম্যান!

১৯৩৯ সালের জুন মাসে শিল্পী বব কেন ও বিল ফিনজার ওই অ্যাকশন কমিক্‌সের পৃষ্ঠায় সৃষ্টি করলেন একটি নতুন চরিত্র। পরনে ধূসর রঙের আঁটোসাটো ট্রাউজার্স, গলায় নীল রঙের চাদর উড়ছে। ট্রাউজার্সের সঙ্গে রয়েছে একটি হলুদ রঙের বেল্ট, এই বেল্টে আছে অদ্ভুত সব অস্ত্র। এই চরিত্রটির

পোশাকধারী মহাশক্তিমান এই প্রবাদপুরুষটি পরিচিত হয়ে ওঠেন ব্যাটম্যান নামে।

ব্যাটম্যান -এর স্রষ্টা বব কেন নিজের সৃষ্ট চরিত্রটিকে রুটিনমাফিক অন্য সুপার-হিরোদের থেকে আলাদা রাখতে চেয়েছিলেন। বোধ হয় সেইজন্যেই অন্য আর পাঁচটা প্রবাদ পুরুষের মতো ব্যাটম্যান অলৌকিক শক্তির অধিকারী নন। কোনান, সুপারম্যান, ম্যানড্রেক বা টিনএজ নিন্‌জা টারটেলস্‌-এর মতো জাদু তলোয়ার, লেজার বিম ছোঁড়ার ক্ষমতা, সম্মোহন-শক্তি, বা আকাশে- বাতাসে- জলে অবলীলাক্রমে ভেসে থাকার সুবিধে কোনওটাই নেই ব্যাটম্যান-এর। ছেলেবেলায় বাবা নৃশংসভাবে খুন হওয়ার পর থেকেই নানা মনের অসুখে ভুগছিলেন ব্রুস ওয়েন। ব্যাটম্যান-এর চরিত্রে ঘটেছে তারই আংশিক প্রতিফলন। বব কেন নিজের সৃষ্ট চরিত্রটিকে এক মানবদরদী, পরোপকারী এবং রোম্যান্টিক ছন্দে বাঁধতে চেয়েছিলেন। তাই কমিক স্ট্রিপে প্রবেশ ঘটেছিল ব্যাটবন্ধু রবিন-এর এবং ব্যাট-বান্ধবী ভিকি ভেইল-এর।

নাম ব্যাটম্যান!

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল অবধি পৃথিবীর ইতিহাসের এক রক্তক্ষয়ী অধ্যায়। হিটলার, স্তালিন, নাৎসি আর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অধ্যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অধ্যায়!

রক্তক্ষয়ী এই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পড়েছিল কমিক্‌স বইয়ের পাতায়। সব কমিক্‌স লেখক চেয়েছেন অতিমানবীয় শক্তির আধার এক-একটি চরিত্র তৈরি করতে। এটাই হল অতিমানবীয় 'কমিক্‌সম্যান' সৃষ্টির পটভূমিকা। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১—এই দু'বছরের মধ্যে শুধু আমেরিকাতেই তৈরি হয়েছিল এগারোটি কমিক্‌সম্যান! স্যান্ডম্যান, আলট্রাম্যান, ডলম্যান, বুলেটম্যান, আকুয়াম্যান, হ্যাংম্যান—এ-ধরনের এক-একটি নাম। প্রত্যেকেই অতিমানবীয় শক্তির আধার, বাহুবলের সাহায্যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই তাঁদের জীবনের ব্রত। হ্যাংম্যান অপরাধীদের গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখে, প্লাস্টিকম্যান তার দেহটাকে যখন-তখন যে-কোনও আকারে বদলে দিতে পারে, ডলম্যান যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঢুকে যায়, আর বুলেটম্যান প্রকৃতপক্ষে একজন বিজ্ঞানী। অপরাধীদের দমন করার জন্য তিনি বিশেষ এক ধরনের রাসায়নিক দ্রবণ আবিষ্কার করেছেন, সেই ওষুধ পান করলেই তাঁর শরীর বুলেটের মতো হয়ে যায়।

না, এইসব কমিক্‌স বইয়ের এইসব সুপারহিরো শেষ অবধি ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেছেন। পরবর্তী প্রজন্ম তাঁদের মনে রাখেনি। টিকে রয়েছে মাত্র দু'জন অতিমানবীয় কমিক্‌সম্যানের অস্তিত্ব। একজন সুপারম্যান, আর একজন ব্যাটম্যান!

সুপারম্যান ও ব্যাটম্যান, পঞ্চাশ বছর বয়সী জনপ্রিয় এই দুই কমিক্‌সম্যানের মধ্যে

ব্যাটম্যান ডাকলেই এসে হাজির হয় তাঁর গাড়ি 'ব্যাটমোবিল'

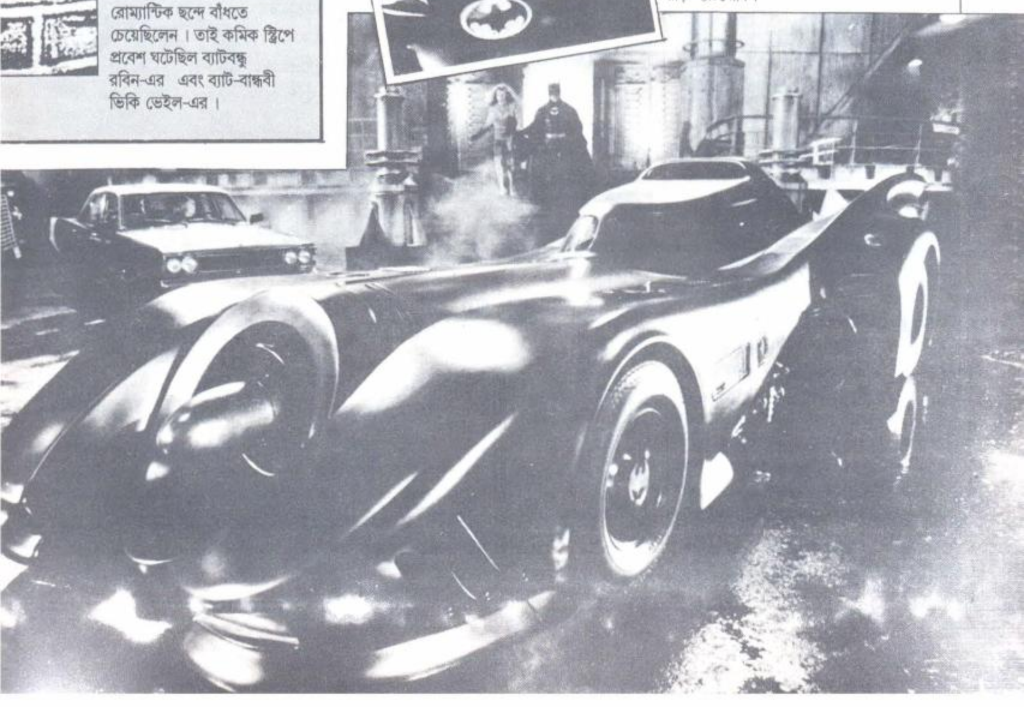

পার্থক্য কী ? সুপারম্যান প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীর মানুষ নন। ক্রিপটন গ্রহে বিস্ফোরণের ফলে এই পিণ্ডটি ছিটকে এসে পৃথিবীতে পড়েছিল। স্মলভিল শহরের জোনাথন ও মার্থা ক্লেন্ট তাকে উদ্ধার করে, পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করে, নাম রাখে ক্লার্ক কেন্ট।

যে সব অস্ত্র নিয়ে ব্যাটম্যান লড়াই করেন

কমিক্‌সের সব চরিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, আছে নিজস্ব অস্ত্র। সুপারম্যান ও হি-ম্যান অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাহুবলে বিশ্বাসী, স্পাইডারম্যান মাকড়সার জাল ছুঁড়ে অপরাধীদের বন্দী করে। ম্যানড্রেকের প্রধানতম শত্রু 'আর্ট' লেসার গান ব্যবহার করে, কিন্তু হায়, তার কাছে জাদু-স্ফটিক নেই! ম্যানড্রেকের জাদু-স্ফটিকের সম্মোহনের কাছে লেসার গানও হেরে যায়! প্রোফেসর ক্যালকুলাস ভুলোভালা মানুষ, তিনি টিনটিনকে চন্দ্রাভিযানের নতুন রকেট উপহার দিতে পারেন, নতুন ওষুধ আবিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু মারণাস্ত্র আবিষ্কারে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। একমাত্র ব্যাটম্যান-ই গোথাম নগরীর বুকে নেমে পড়েছেন অদ্ভুত সব অস্ত্র নিয়ে। দুঁদে অপরাধী জোকারের দলের বিরুদ্ধে লড়াই করে গোথাম নগরীতে শান্তিরক্ষা করতে হয়, অস্ত্র ছাড়া চলবে কী করে ? অন্যায় ও অপরাধের বিরুদ্ধে যে

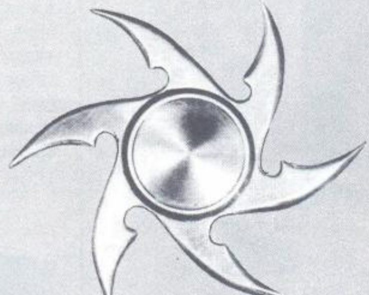

নিন্‌জা চক্র

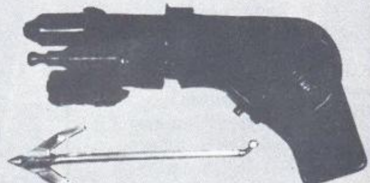

বর্শা-বন্দুক। লোহার দস্তানার মতো এই বন্দুক ব্যাটম্যানের হাতে থাকে।
আঁকশি-ওয়ালা বর্শা এই বন্দুক থেকে নিক্ষেপ করা যায়।

পক্ষান্তরে, ব্যাটম্যান এই পৃথিবীর মানুষ। তাঁর নাম ব্রুস ওয়েন, থাকেন গথাম শহরে। তাঁর পিতার নাম টমাস ওয়েন, মায়ের নাম মার্থা। জোয়ি চিল নামে এক দস্যু টমাস ও মার্থাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ব্রুস প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি বড় হয়ে এই অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবেন। এই প্রতিজ্ঞা পৃথিবীর মানুষের প্রতিজ্ঞা ! এবং ব্রুস ওয়েন জলজ্যান্ত একজন মানুষ।

শেক্‌সপিয়র-এর নাটক আমাদের শিখিয়েছিল, 'ফুল' (বোকা)ও মাঝে-মাঝে বুদ্ধিমানের মতো কথা বলে। বব কেনের ব্যাটম্যান শেখালেন, জোকার ও পেঙ্গুইন হতে পারে ভয়ঙ্কর অপরাধীর নাম।

অপরাধীদের মোকাবিলা করার সময় সুপারম্যান কঠোর, অবিচল এক মানুষ ! ব্যাটম্যান মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষের সময়েও রসিকতার সুযোগ ছাড়েন না ! জোকারকে একবার ঘুসি মেরে তিনি বলেছিলেন, "তুমি জোকার ? আমি তা হলে চিড়িতনের রাজা।"

পেঙ্গুইন লোকটি দক্ষিণ মেরুর পেঙ্গুইনদের মতো গোলগাল দেখতে, হেলেদুলে চলে। প্রোফেসর মরিয়ারিটির মতো সেও বলে, "নিখুঁত অপরাধ হল একটা শিল্পকর্ম !" পেঙ্গুইন অবশ্য এরকম নিখুঁত শিল্পের পরিচয় একবারও দেখাতে পারেননি, তিরিশবার তিনি ব্যাটম্যানের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

জোকার ও পেঙ্গুইন কেউই মারা যায়নি। ব্যাটম্যান জোকারের বিরুদ্ধে পঁয়ত্রিশবার সফল হয়েছেন, কিন্তু জোকারের মৃত্যু হয়নি। ১৯৬৫ সালে পেঙ্গুইনকে জেলখানায় পাঠানো হয়। কমিক্‌স বইয়ে জোকার ও পেঙ্গুইন পৃথিবীতে আজও বেঁচে আছে !

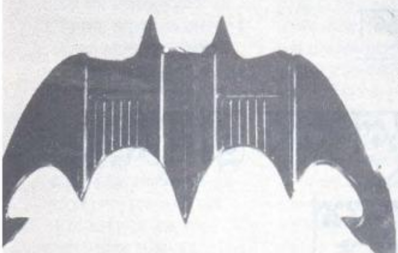

ব্যাটারাং বা মেয়ে-বাদুড়ের ডানা

শত্রুদের লৌহতারের নাগপাশে বন্দী করে টেনে আনার জন্য এই চাকাটি ঘোরাতে হবে।

এই দুটি ইস্পাতদণ্ডের সাহায্যে লোহার জাল ছোঁড়া হয়।

সমস্ত অস্ত্র নিয়ে ব্যাটম্যানকে লড়াই করতে হয়, সেইসব অস্ত্রের নকশা করেছিলেন জন ইভান্স ও তাঁর সহযোগী দল। না, ব্যাটম্যানের কাছে কখনওই পরমাণু বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ইত্যাদি থাকে না। শান্তিকামী পৃথিবীতে তার দরকারও নেই। ব্যাটম্যানের অস্ত্রগুলি অদ্ভুত হলেও গঠনের দিক থেকে বেশ সহজ, সরল। হাতে হাতেই চটজলদি ব্যবহার করা যায়। এইসব অস্ত্রই ব্যাটম্যানের কোমরবন্ধে রাখা থাকে। অস্ত্রগুলির মধ্যে আছে নিন্‌জা চক্র, ব্যাটারাং বা মেয়ে-বাদুড়ের ডানা এবং একটি বিশেষ ধরনের বন্দুক। নিন্‌জা চক্র কিন্তু আমাদের বহু পরিচিত চক্রের তুলনায় একেবারে আলাদা, এতে ইস্পাতের ধারালো ছ'টি ফলা আছে। শত্রুদের হতভম্ব করে দেওয়ার জন্য এই অস্ত্রটি যথেষ্ট! ব্যাটারাং নিরাপত্তা দেয় ভিকি ভেলকে। এই মহিলা পেশায় চিত্র-সাংবাদিক। বর্শা-বন্দুক অপরাধী জোকারের দলকে বন্দী করে। দূর থেকে এটি নিক্ষেপ করতে হয়। ইন্দ্রজিৎ যেমন লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্দী করেছিলেন, ব্যাটম্যানও সেরকম লোহার জাল ছুঁড়ে অপরাধীদের বন্দী করেন।

ব্যাটম্যান ছায়াছবিতে অবশ্য জোকার বিশাল এক বাড়ির ওপর থেকে পড়ে মারা যাচ্ছে।

তাই সুপারম্যানের শত্রুদের তুলনায় ব্যাটম্যানের শত্রুরা অপেক্ষাকৃত মানবিক। সুপারম্যানের শত্রুরা শুধুমাত্র অপরাধ নিয়েই কারবার করে, আর ব্যাটম্যানের শত্রুরা অপরাধ করে, কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু 'মানবিক' গুণও আছে। ব্যাটম্যানের এক শত্রু হেঁয়ালি করতে ভালবাসত। অপরাধের সমাধানের জন্য সে ধাঁধা রেখে যেত। ব্যাটম্যানের সঙ্গে সে বুদ্ধি দিয়েও লড়াই করতে চায়!

তাই সুপারম্যানের তুলনায় ব্যাটম্যান আমাদের আরও কাছের। তিনি আমাদের মতোই এক পার্থিব, রক্তমাংসের মানুষ। গথাম শহর ছাড়াও ফ্লোরিডাতে তিনি একটি বাড়ি কিনেছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে ব্রুস ওয়েন প্রচুর সম্পত্তির মালিক, নিজের টাকায় তিনি 'ওয়েন ফাউন্ডেশন' নামে একটি সমাজসেবী সংগঠন খুলেছেন।

১৯৪১ সাল থেকে ব্যাটম্যান গথাম শহরের পুলিশবাহিনীর সাম্মানিক সদস্য। পঞ্চাশের দশকে ব্যাটম্যানের সঙ্গে আচমকা কয়েকজন বিখ্যাত মানুষের দেখা হয়ে গিয়েছিল। এঁরা হলেন থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, আলাদিন ও ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। এঁরা সবাই এই পৃথিবীর মানুষ। এ-সবই কমিক্স বইয়ের কাণ্ডকারখানা।

তাই ব্যাটম্যানের বন্ধুত্ব পৃথিবীর সঙ্গে, পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে, তাঁর জগৎ এই পৃথিবীকে নিয়ে। তাঁর বান্ধবী ভিকি ভেল এই

পৃথিবীরই এক নারী, রবিন এই পৃথিবীরই একজন বালক। আর সুপারম্যান এতদিন পৃথিবীতে থেকেও আমাদের সঙ্গে বোধ হয় কোনও আত্মীয়তা অনুভব করেন না। তাই কমিক্স বইয়ের পাতায় সুপারম্যানকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছে একের পর এক সুপারচরিত্র। সুপারবয়, সুপারগার্ল।

ব্যাটম্যানের সঙ্গে সুপারম্যানের পার্থক্যটা সেখানেই! ব্যাটম্যান রক্তমাংসের একজন সাধারণ মানুষের নাম। ব্যাটম্যান একজন মানুষের নাম।

নাটক শেখার স্কুল

দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার খ্যাতি দেশে-বিদেশে

দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা। ইনসেট : অস্থায়ী ডিরেক্টর কীর্তি জৈন

দেশে এবং দেশের বাইরে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। সঙ্গীত-নাটক অকাদেমি, ন্যাশনাল অকাদেমি অব মিউজিক, ডান্স অ্যান্ড ড্রামার উদ্যোগে ১৯৫৯ সালে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা এবং এশিয়ান থিয়েটার ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের যুগ্ম প্রচেষ্টায় ও সরকারি অর্থানুকূল্যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা' নামে এক স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পরিণত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে তিন বছরের কোর্স শেষ হওয়ার পর সফল ছাত্রছাত্রীদের 'ডিপ্লোমা ইন ড্রামাটিকস' দেওয়া হয়। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নাট্য সাহিত্যের তত্ত্ব, মূকাভিনয় ও ভাবভঙ্গি, মার্শাল আর্টস, যোগ ও সঙ্গীত, মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, পোশাক-আশাকের নকশা, আলো, মেক-আপ, নাট্যস্থাপত্য প্রভৃতি বিষয় পড়ানো হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীদের পছন্দমতো ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, অভিনয় কিংবা প্রযোজনা ('প্রোডাকশন প্রসেস') যার যেমনটি পছন্দ। তিন বছরের সফল ডিপ্লোমা কোর্স শেষে ছাত্রছাত্রীরা থিয়েটার সম্পর্কিত গবেষণাপত্র কিংবা 'প্রজেক্ট রিপোর্ট' জমা দিলে এক বছরের ফেলোশিপ পেতে পারেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ভারত সরকার এই ডিপ্লোমাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব মেনে নিয়েছেন। আরও সুখবর, যেসব ছাত্রছাত্রীর বি-এ ডিগ্রি আছে এবং যাঁরা এই শিক্ষায়তনের ডিপ্লোমা ইন ড্রামাটিক্স লাভ করেছেন তাঁদের এই শিক্ষাগত যোগ্যতাকে এম-এ ডিগ্রির সমমর্যাদা দেওয়া হবে। তাঁরা বিভিন্ন কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসাবে নিযুক্ত হতে পারবেন। এমনকী, পিএইচ. ডি-র জন্য 'রেজিস্ট্রেশন'ও করাতে পারবেন।

> যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা নাট্যপ্রযোজনা এবং অভিনেতা তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশের বহু কৃতী নাট্যপ্রযোজক যেমন, ই. আলকাজি, কীর্তি জৈন প্রমুখ যুক্ত হয়েছেন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।

কীভাবে ভর্তি হবেন

এবার ভর্তির নিয়মকানুন জানা দরকার। কোর্সটি আকর্ষক, তাই, ভর্তির ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ থাকা বাঞ্ছনীয়ও বটে। প্রথমেই জানিয়ে রাখি—আঠারো বছর থেকে তিরিশ বছর বয়সী যে-কোনও ছেলে-মেয়ে এই কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। ভর্তির জন্য আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে। দশ টাকার পোস্টাল অর্ডার পাঠালে ডিরেক্টর, ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা, বাহাওয়ালপুর হাউস, ভগবানদাস রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০১ ঠিকানার অফিস থেকে আবেদনপত্র

পাওয়া যায়। অবশ্য কোন্ সময়ে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র দেওয়া হয় সেই খবর দেশের প্রধান কয়েকটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানানো হয়। মার্চ মাসের মধ্যেই সাধারণত এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে।
এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে কমপক্ষে হায়ার সেকেন্ডারি (আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক ১০ + ২ পর্যায়ের) পাশ হতে হবে। আর শুধু কেতাবি ডিগ্রি নিয়ে বসে থাকলেই চলবে না,অধিকন্তু

থিয়েটারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। যেমন কমপক্ষে দশটি নাটকে অভিনয় কিংবা থিয়েটার সংক্রান্ত অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।
আবেদনপত্রের সঙ্গে সমস্ত শংসাপত্রের প্রত্যয়িত নকল পাঠাতে হয়। মূল শংসাপত্র পাঠানোর দরকার নেই। এ ছাড়া সদ্যতোলা ছ' কপি ফোটোগ্রাফও দিতে হয় সঙ্গে। আবেদনপত্রগুলো খুঁটিয়ে দেখে প্রার্থী বাছাই করা হয়। তারপর বাছাই করা প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ে ডাকা হয়। যাঁরা মনোনীত হন তাঁদের ডাকযোগে জানিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনী পরীক্ষায় 'অডিশন টেস্ট' নেওয়া হয়। তারপর চূড়ান্ত নির্বাচনী ইন্টারভিউ হয় নতুন দিল্লির শিক্ষায়তনে। প্রয়োজনে প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনী পরীক্ষা নতুন দিল্লির বাইরে নির্ধারিত কেন্দ্রেও নেওয়া হয়। ভর্তি হওয়ার পরও ছাত্রছাত্রীদের গভীর মনোযোগ প্রয়োজন। প্রথম বর্ষের শেষে যদি দেখা যায় কোনও ছাত্র বা ছাত্রীর ফলাফল সন্তোষজনক নয়, সে-ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে তাকে শিক্ষায়তনে রাখা হবে কি না এ-বিষয়ে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ চিন্তাভাবনা করে দেখতে পারেন। এ-ক্ষেত্রে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
শিক্ষার মাধ্যম হিন্দি এবং ইংরেজি। তবে প্রয়োজনমতো আঞ্চলিক ভাষায়ও নাটক ইত্যাদি করানো হয়। ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়াও হিন্দি এবং ইংরেজিতে জ্ঞান থাকা দরকার। প্রতি বছর জুলাই মাসে সেশন শুরু হয়। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সঙ্গে-সঙ্গে খুব পরিশ্রম করতে হয়। এজন্য প্রার্থীদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া দরকার। ভর্তির সময় সে-বিষয়ে ডাক্তারের শংসাপত্রও জমা দিতে হয়। প্রয়োজনে শিক্ষায়তন থেকে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়।

পড়াশোনার খরচ

এই প্রতিষ্ঠানের পড়াশোনার খরচ খুব বেশি নয়। ভর্তি-ফি পঁচিশ টাকা, মাসিক মাইনে পঁচিশ টাকা। এ ছাড়া অনুশীলন ক্লাসের জন্য, পোশাক-আশাকের জন্য ফি দিতে হয়। যেমন দু' প্রস্থ কালো সুতির পোশাকের জন্য আড়াইশো টাকা, মেক-আপ কিট এবং অন্যান্য জিনিসের জন্য অগ্রিম দিতে হয় পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা। অবশ্য এই দুটো টাকাই পরবর্তীকালে অ্যাডজাস্ট করা হয়। এ ছাড়া স্টুডেন্টস ইউনিয়ন-ফি দিতে হয়

বারো টাকা ; লাইব্রেরি ডিপোজিট মানি তিনশো টাকা, হস্টেলে থাকার জন্য মাসিক তিরিশ টাকা, জল এবং বিদ্যুতের জন্য মাসিক বারো টাকা, অন্যান্য খরচ মাসিক পাঁচ টাকা, চিকিৎসার জন্য মাসিক এক টাকা, হস্টেলের খরচ মাসিক কমবেশি দু'শো পঁয়ষট্টি টাকা। এ ছাড়া শ'পাঁচেক টাকার বই-ও কিনতে হয়। তবে এই শিক্ষায়তন মাসিক চারশো পঞ্চাশ টাকা হারে কুড়িটি স্কলারশিপ দেন দরিদ্র এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের।

বিষয়সূচি

এখানে পড়ানো হয় ধ্রুপদী ও আধুনিক ভারতীয় নাটক, পাশ্চাত্যের নাটক, কণ্ঠস্বর ও ভাষণ, যোগ, মূকাভিনয় ও ভাবভঙ্গি, অভিনয়, নাট্যসঙ্গীত, নাট্যস্থাপত্য, মঞ্চসজ্জা, সাজপোশাকের নকশা, মঞ্চের আলো, মেক-আপ, প্রযোজনা। এইসব কোর্স ছাড়াও এই শিক্ষায়তন ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি নিয়ে নিয়মিত কর্মশালার আয়োজন করেন এবং 'স্টুডেন্টস অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স' পরিচালনা করেন।
প্রত্যেকটি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীর শিক্ষণীয় বিষয়ের যথার্থতা এবং কৃতকার্যতার মূল্যায়ন করা হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষে,অর্থাৎ, প্রথম থেকে চতুর্থ পর্যায়ে নাট্যসাহিত্য, অভিনয়, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি বিষয়ের মূল্যায়ন করার পর সংশ্লিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রীর উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পর্যায়ে অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষে প্রযোজনায় অংশগ্রহণ, স্বতন্ত্র কর্মশালা, ' অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যান্ড আদার কোর্সেস', 'শর্ট টার্ম কোর্সেস অ্যান্ড প্রজেক্ট','ভাইভা অ্যান্ড স্টাফ অ্যাপ্রাইজাল' বিষয়ে মূল্যায়ন করা হয়। নিয়মিত ক্লাস, বিভিন্ন নাটকে অংশগ্রহণ ইত্যাদি সব বিষয়ের মূল্যায়ন এবং পরীক্ষার মূল্যায়ন করার পর ছাত্রছাত্রীর উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মাসিক পরীক্ষা এবং অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীদের ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ কম। সারা বছর ব্যস্ত থাকতে হয় পড়াশোনা এবং নানারকম অনুশীলনের মধ্যে। তবে শীতকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন অবকাশ অবশ্য রয়েছে।
এই কোর্স পাশ করে থিয়েটারকে পেশা হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া ভারত সরকারের বেতার কিংবা দূরদর্শনে ভাল পদে চাকরি পাওয়া সম্ভব। উপরন্তু বিভিন্ন নাটকের স্কুলে কিংবা সংস্থায় শিক্ষকতার কাজের সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। সর্বোপরি নাটক বিষয়ে জ্ঞানলাভের পর নিজের উদ্যোগে প্রযোজনা শুরু করা যেতে পারে। এসব কাজে সৃষ্টির আনন্দ যেমন আছে, তেমনই আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কাও কম। অভিনয় নিয়ে যাঁরা জীবন গড়তে চান তাঁদের কাছে এই প্রতিষ্ঠান তীর্থস্থান।

ভর্তির জন্য যা দরকার

দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা শিক্ষায়তনে ডিপ্লোমা ইন ড্রামাটিকস কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি বেরোয় বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্রে, সাধারণত মার্চ মাসে। শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় জুলাই মাস থেকে। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ এবং অভিনয়ের সঙ্গে যাঁদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে তাঁরা ভর্তির আবেদন করতে পারেন। কোর্সের মেয়াদ তিন বছর। দশ টাকার পোস্টাল অর্ডার পাঠিয়ে প্রসপেক্টাস ও আবেদনের ফর্ম সংগ্রহ করতে হয় এই ঠিকানা থেকে : ডিরেক্টর, ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা, বাহাওয়ালপুর হাউস, ভগবানদাস রোড, নতুন দিল্লি-১১০ ০০১। হিন্দি এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই পড়ানো হয়। ভর্তির সময় সর্বসাকুল্যে খরচ পড়ে ৩৬২ টাকা। অনুশীলন ক্লাসের পোশাক-আশাক, মেক-আপ ইত্যাদির জন্য অগ্রিম জমা দিতে হয় ৮২৫ টাকা। হস্টেলের ব্যবস্থা আছে। থাকার খরচ মাসিক ৪৮ টাকা এবং খাওয়ার জন্য লাগে ২৬৫ টাকা। মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য ২০টি মাসিক বৃত্তি দেওয়া হয় ৪৫০ টাকা হারে। এই ডিপ্লোমা ভারত সরকার স্বীকৃত ; অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ'র সমতুল। গবেষণারও সুযোগ পাওয়া যায়।

গোবিন্দ কবিরাজ

হিমানীশ গোস্বামী

ঘটনাটা প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার, দু'-পাঁচ বছর বেশিও হতে পারে।

গোবিন্দ কবিরাজের কাছে এসেছেন আদিত্যনারায়ণ। আসতেই হয়, বুড়ো হয়েছেন বলে তিনি কোথাও যেতে চান না। টাকার লোভ দেখিয়েও কিছু লাভ হয় না। তিনি বলেন, "কত টাকা বললে, পাঁচ টাকা ? টাকা নিয়ে করবটা কী আমি, অ্যাঁ ? টাকার কথা বোলো না।" গোবিন্দ কবিরাজকে বাড়িতে আনা চাট্টিখানি কথা নয়। টাকা তিনি বিশেষ নেন না ঠিকই, তবে একটা পালকির্ ব্যবস্থা করতেই হয়। সেও বেশ কয়েক টাকার ধাক্কা!

আসলে ভীষণ অলসও হয়ে পড়েছেন গোবিন্দ কবিরাজ। চিকিৎসাই করতে তাঁর ইচ্ছে করে না একদম। কারও অসুখ করলে জিজ্ঞেস করেন, "বয়স কত হল ? ছাপ্পান্ন ? তা বেশ তো পাকা বয়স হয়েছে, এ পৃথিবীর অনেকটাই ধ্বংস করেছেন মশাই, আর কেন ? এবারে হুট করে মরে গেলেই তো হয়।" তবে আদিত্যনারায়ণকে তিনি খুব দরকার না হলে কোনও কড়া কথা বলেন না। আদিত্যনারায়ণের বাবা প্রদ্যোতনারায়ণ ছিলেন গোবিন্দ কবিরাজের প্রাণের বন্ধু। আদিত্যনারায়ণের ঘুম হয় না, এটাই তাঁর প্রধান অসুখ। এটাকে অবশ্য অসুখ বলেই মনে করেন না গোবিন্দ কবিরাজ। বলেন, "জমিদারের ছেলে জীবনে পরিশ্রম করলে না, তা ঘুম হবে কেমন করে ? দিনে সাত মাইল দৌড়ও, কিংবা যদি তা না পারো, দশ মাইল হনহন করে হাঁটো, সকালে পাঁচ বিকেলে পাঁচ, দ্যাখো ঘুম আসে কি না। যত সব!"

তবু বসে থাকেন আদিত্যনারায়ণ। বলেন, "বয়স হয়েছে, এখন কি আর দৌড়নো পোষায় ? একটা ওষুধ দিন গোবিন্দকাকা, যাতে এক ঘুমে রাত কাবার হয়।"

"কত বয়স হল তোমার যেন দীপনারায়ণ ?"

"আজ্ঞে, আমার নাম আদিত্যনারায়ণ, দীপনারায়ণ আমার দাদা।"

"ও ভুলে গিয়েছিলাম।" গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, "দীপনারায়ণ

তোমার দাদা ?"

"আজ্ঞে।"

"বয়স কত হল ?"

"আজ্ঞে, আমার আটান্ন চলছে।"

"আটান্ন চলছে ?" গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, "আটান্ন চলছে আবার ঘুমোতেও চাও, এক ঘুমে রাত কাবার করতে চাও, মামাবাড়ির আবদার ? জানো, এই বয়সে পৌঁছেছ, এ তোমার বাপের ভাগ্যি ? আমার কথা শুনবে ? আমার রোজ রাত্রে চারবার ঘুম ভেঙে যায় !"

খক্ খক্ করে কাশতে থাকেন গোবিন্দ কবিরাজ। তারপর একটু সামলে ওঠেন। আবার বলেন, "এ দেশের মানুষ হয়ে আটান্ন বছর বেঁচে আছ ? পুলিশে ধরে না ?"

আদিত্যনারায়ণ চুপ করেই থাকেন। তিনি জানেন এই সব কথা শুনে যেতে হবে, নইলে ওষুধ মিলবে না।

"কী, চুপ করে রইল যে ?" গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, "তোমাকে পুলিশে ধরে না ? এতদিন বেঁচে আছ ! জানো তো আমাদের দেশের মানুষের গড় আয়ু কত ? সাতাশ বছর ! পুলিশ একবার টের পেলে লাঠিপেটা করে খতম করে দিতে পারে জানো ?"

"আজ্ঞে।" এইটুকুই বলতে পারলেন আদিত্যনারায়ণ। তাঁর অবশ্য মনে হল, গোবিন্দ কবিরাজের তো বয়সের গাছ-পাথর নেই, বয়স আশি কবে পেরিয়ে গেছে, ওঁকে যখন পুলিশ পিটিয়ে মারেনি, তখন আদিত্যনারায়ণকেই বা মারবে কেন ? মনে হলেও কথাটা তিনি উচ্চারণ করলেন না।

"দীপ তো তোমার চাইতে বড় ?"

"আজ্ঞে, ন' দিনের বড়।"

"ওর তো ঘুমের ব্যাঘাত হয় না ? তোমারই তো আপন ভাই···· ।"

"খুড়তুতো ভাই, আপন ভাই নয়," আদিত্যনারায়ণ বললেন।

"একই বংশের তো !" গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, "অথচ তার কোনও ঘুমের কষ্ট নেই, আর তোমার হল ঘুমের কষ্ট ? সত্যি কথা বলছ ?"

"আজ্ঞে, কাকা সত্যি কথাই বলছি। মিথ্যে কথা বলার জন্য এত দূরে আসবই বা কেন আপনাকে বিরক্ত করতে ?"

"বোসো তা হলে।" গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, "আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি, এই ওষুধ খেলে তিন-চার ঘণ্টা ঘুম হবেই। তবে সারাদিন বাড়িতে বসে থাকলে চলবে না। হাঁটা-চলা করতে হবে, দৌড়তে হবে, পুকুর এপার-ওপার করতে হবে। মোট কথা শরীরটাকে ব্যস্ত রাখতে হবে। পারবে ?"

"আজ্ঞে বেশি চলাফেরা করলে হাঁটুতে ব্যথা হয়," আদিত্যনারায়ণ বললেন।

"বেশি চলাফেরা করতে কে বলেছে ?" গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, "বললাম তো দিনে সাত মাইল দৌড়তে না পারো, মাইল দশেক ধীরে-ধীরে হাঁটলেই চলবে। পারবে তো ? তা ছাড়া দিনে একবার সাঁতার কেটে পুকুর এপার-ওপার করবে। পারবে ?"

"আজ্ঞে, হাঁটুর ব্যথাটা··· ।"

"হাঁটু ? দেখি, হাঁটুকে এদিকে আনো একবার দেখি।"

আদিত্যনারায়ণ গোবিন্দ কবিরাজের কাছে গেলেন। একটা খাটিয়ায় বসেছিলেন তিনি। বললেন, "পাশে বোসো তো একবার !" আদিত্যনারায়ণ খাটিয়ায় বসলে গোবিন্দ কবিরাজ তাঁর হাঁটু এমন জোরে টিপে ধরলেন যে আদিত্যনারায়ণ গাঁগাঁ করে চিৎকার করে উঠলেন।

"চমৎকার !" গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, "পেশী বেশ সবল এবং সুস্থ আছে।" নাড়ি পরীক্ষা করে বললেন, "ভারী চমৎকার। আরও পনেরো বছর টিকে যাবে বলে মনে হয়।"

এর পর প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে নানারকম ওষুধ মিশিয়ে দশটা পুরিয়া করলেন। বললেন, "রাত্রে শোওয়ার আগে একটা করে পুরিয়া খাবে। হাঁটাচলা করবে, আর-একটা কথা, উদ্বেগ একদম নয়। মনটা পরিষ্কার রাখতে হবে। দুশ্চিন্তা হয় ?"

"আজ্ঞে, নানারকম দুশ্চিন্তা হয়," আদিত্যনারায়ণ বললেন।

"কীরকম দুশ্চিন্তা ?"

"আজ্ঞে, আমার মাঝে-মাঝে মনে হয় গুণ্ডা আমাকে কামড়াবে।"

"অ্যাঁ ?" গোবিন্দ কবিরাজ আঁতকে ওঠেন, "গুণ্ডা কামড়াবে ? গুণ্ডারা কি কামড়ায় নাকি ?"

"আজ্ঞে কাকা, কামড়ায়।" আদিত্যনারায়ণ বললেন, "গুণ্ডা আমার দিকে ধেয়ে এসেছিল বার কয়েক। কোনওমতে আত্মরক্ষা করেছি।"

হাঁ হয়ে রইলেন গোবিন্দ কবিরাজ। বললেন, "যা ভয় করছিলাম, তাই হয়েছে। মাথাটা গেছে। তা তোমাদের বংশে ওটা ছিল বটে, দেখছি এখনও আছে। তোমার বড় জ্যাঠামশাই সুরেন তো একবার একটা সাহেবকে দোলের দিন রং দিয়ে চুবিয়েছিল। অনেক কষ্টে পুলিশের হাত থেকে ছাড়ানো হয়। তুমি এ ঘটনা জানো না, জানবেই বা কেমন করে, তখন তোমার জন্মই হয়নি।"

"আজ্ঞে, মাথা আমার খারাপ হয়নি।" আদিত্যনারায়ণ বললেন, "গুণ্ডা শুনেছি আপনার ওষুধ খায়। ওষুধ খায়, ওষুধ খায়, কিন্তু তার ডাক তো কমে না।"

"কী সব আবোল-তাবোল বকছ আদিত্য ? আমার রোগী গুণ্ডা ?"

"আজ্ঞে, ঠিকই বলেছি আমি।" আদিত্যনারায়ণ বললেন, "দীপদার সাহেব কুকুর, নাম গুণ্ডা, ওর কি কানে ঘা হয়েছিল, আপনি সারিয়ে দিয়েছিলেন। ইয়া বড় কুকুর—ঠিক যেন সোঁদরবনের বাঘ, আর কী ডাক ! ঠিক যেন মেঘের গর্জন ! রাত্তিরে দীপদার বাড়িতে ছাড়া থাকে আর যখন ইচ্ছে ডেকে-ডেকে ওঠে। আর যতবার ডেকে

ওঠে, ততবারই ঘুম ভেঙে যায়।"

"এঃ, আমার পরিশ্রমটাই মাটি করলে। দাও, যে পুরিয়াগুলো দিয়েছিলাম!" গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, "ওগুলো কোনও কাজে লাগবে না। আমি অন্য ওষুধ দিচ্ছি। ওই যে লাল গুলিওলা বয়াম আছে, ওটা আমার কাছে নিয়ে এসো।"

আদিত্যনারায়ণ একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে একটা বয়াম নামালেন, তারপর গোবিন্দ কবিরাজের কাছে আনলেন। গোবিন্দ কবিরাজ তা থেকে তিরিশটা গুলি বার করলেন। বললেন, "প্রতিদিন একটা করে,ব্যস, সমস্যার সমাধান! একমাস পর আবার আসবে।"

"এই গুলি কখন খাব?"

"অ্যাঁ?" গোবিন্দ কবিরাজ যেন চমকে উঠলেন, "এই গুলি তোমাকে আর দয়া করে খেতে হবে না।"

"তবে?"

"গুণ্ডাকে সন্ধেবেলা খাওয়াবে। ওর ঘেউ-ঘেউ করার আর ক্ষমতাই থাকবে না। ঘেউ-ঘেউ কমলেই রাত্রে আর গোলমালও হবে না। গোলমাল না হলে তোমার ঘুমও হবে। ব্যস, সমস্যার সমাধান।"

"এ আমার দ্বারা হবে না গোবিন্দকাকা!" আদিত্যনারায়ণ বললেন, "গুণ্ডাকে ওষুধ খাওয়ানো আমার কর্ম নয়। তার চাইতে আমি পাংসাতেই চলে যাই, ওখানে মামাবাড়িতেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিই। না হয় মরেই গেলাম এবারকার মতো!"

"সামান্য একটা কুকুরকে দিনে মাত্র একবার ওষুধ খাওয়াতে পারবে না?"

"না গোবিন্দকাকা!"

"কেন?"

"জানেন তো, দীপদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক তেমন ভাল নয়। পাশাপাশি বাড়ি। তিরিশ বছর আগে একটাই বাড়ি ছিল, তারপর মাঝখানে দেওয়াল তুলে ভাগ করা হয়।পাতলা দেওয়াল। তারই একটা ঘরকে দু' ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। আমি আর দীপদা প্রায় পাশাপাশিই ঘুমোই বলতে গেলে। ওর নাক ডাকলে আমি শুনতে পাই। আমি আঙুল মটকালে ও শুনতে পায়। কিন্তু আমাদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ। কথা বলার দরকার হলে আমরা অন্য লোক ডাকি। যেন দোভাষী। তবে আমি বাংলায় যা বলি সেও সেই কথাই বলে দীপদাকে। দীপদাও বাংলাতেই উত্তর দেন, আবার সেটা সেই মধ্যস্থ ব্যক্তি আমাকে বলে। খুব দরকার না হলে এটা করা হয় না।"

"তুমি বললে তোমার দীপদার নাক ডাকে।"

"ডাকে।"

"তাতে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না?"

"হত এককালে, কিন্তু এখন সয়ে গেছে।"

খকখক করে কাশলেন গোবিন্দ কবিরাজ। তারপর বললেন, "বড় কঠিন সমস্যা। বড়ই কঠিন সমস্যা। তবে এর একটা বিহিত করতেই হবে। তুমি মধ্যস্থের মাধ্যমে দীপকে বলো যে, আমি বলেছি ওই গুণ্ডাকে রোজ সন্ধেয় একটা করে লাল বড়ি খাওয়াতে হবে। যদি রাজি না হয় তা হলে দীপ যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। ওকে রাজি করানোর ওষুধ এই শর্মার বিলক্ষণ জানা আছে!"

তা জানা আছে বটে গোবিন্দ কবিরাজের। গ্রামের দশ মাইলের মধ্যে একটা ভাল ডাক্তার নেই, কবিরাজ নেই। বিপদে-আপদে এখনও তিনিই ভরসা। পাকে পড়ে দীপনারায়ণকে তাই রাজি হতেই হল। গোবিন্দ কবিরাজের লাল বড়ি খেয়ে রাত্রে গুণ্ডার ডাক একেবারে থেমে গেল বটে, কিন্তু দীপনারায়ণ মনে-মনে আদিত্যনারায়ণের উপর ভারী চটে রইলেন।

আর আশ্চর্য, আদিত্যনারায়ণেরও ঘুম হতে লাগল। রোজ অবশ্য হাঁটা-চলাও করতে লাগলেন। গোবিন্দ কবিরাজকে ফাঁকি দেওয়ার জো নেই, একবার যদি ওঁর কথা কেউ অমান্য করে, তা হলে গোবিন্দ কবিরাজ তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। এমনকী লোকে বলে, উনি লোককে ওষুধ দিয়ে ভাল করার চাইতে শাস্তি দিতে বেশি ভালবাসেন। ওঁর শাস্তি হল, যার উপর রাগ তার চিকিৎসা না করা! কারও উপর হুকুম হয় দু' সপ্তাহ, কারও উপর দু' মাস, কারও উপর আবার এক বছর! আবার সামান্য কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে তিনি চার রকম ওষুধ দেন, সবই তেতো। চার রকম ওষুধের মধ্যে একটা হল সত্যিকারের ওষুধ, বাকিগুলো ওষুধই নয়! কিন্তু কোনটা যে ওষুধ আর কোনটা ওষুধ নয়, সেটা তিনি বলে দেন না মোটেই। লোকেরও উপায় নেই, তাদের সহ্য করতেই হয়। যাই হোক, আদিত্যনারায়ণ গোবিন্দ কবিরাজের কথামতো হাঁটেন ঠিকই, কিন্তু পাঁচ-দশ মাইল নয়, মেরেকেটে দু'-আড়াই মাইল। কখনও তিন মাইলও হয়তো হয়ে যায়।

যাই হোক, দিব্যি চলছিল। এর মধ্যে আদিত্যনারায়ণ একটা চিঠি পেলেন গোবিন্দ কবিরাজের কাছ থেকে। চিঠিটা গোবিন্দ কবিরাজের নাতি হিমাংশু নিয়ে এসেছিল। চিঠিটার মর্ম এই: "শুনলাম তুমি আমার কথার অবাধ্য হয়েছ। রোজ দু'-তিন মাইলের বেশি হাঁটছ না। সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। তিন মাস!"

তিন মাস! অর্থাৎ আগামী তিন মাসের মধ্যে যত অসুখই হোক না কেন, গোবিন্দ কবিরাজ আদিত্যনারায়ণের চিকিৎসা করবেন না। এ-হল মহা মুশকিল। এখন কোনও অসুখ তেমন নেই বটে, কিন্তু হতে কতক্ষণ? আর গোবিন্দ কবিরাজ যখন বলেছেন তখন সত্যিই তিন মাস তিনি তাঁর চিকিৎসা করবেন না। ভারী ভাবিত হয়ে পড়লেন তিনি। তার চাইতেও ভাবিত হয়ে পড়লেন, তাঁর হাঁটার উপর নজর রাখার ব্যাপারে। তাঁর উপর গোয়েন্দাগিরি কে করছে? তিনি গুটিগুটি গোবিন্দ কবিরাজের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। তাঁর উদ্দেশ্য দুটো। তিনি যে রোজ দু'-তিন মাইলের বেশি হাঁটেন না এটা কে জানিয়েছে সেটা জানা, দু' নম্বর হল—তিন মাসের শাস্তিটাকে কমিয়ে আনা।

কিন্তু কোনওটাতেই তিনি সফল হলেন না। গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, "কবিরাজি শাস্ত্র মজার বস্তু নয়। তোমার নাড়ি ধরেই বোঝা যায় তুমি কিছু-কিছু মিথ্যে কথা বলতে সক্ষম। কিন্তু তাই বলে তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করবে, সেটা ভাবতে পারিনি। আমার যে জ্যাঠামশাই ছিলেন, নিলু কবিরাজ, নাম শুনেছ? তিনি নাড়ি একবার পরখ করেই বলে দিতে পারতেন লোকের চরিত্র। কে চোর, কে ডাকাত, কে ভালমানুষ, কে নোট জাল করে, কার কতখানি দেবভক্তি, কে নাস্তিক, কে পড়াশোনায় ফাঁকি দেয়, কে বইপড়ার নাম করে গল্পের বই পড়ে—এ সমস্তই তিনি নখদর্পণে দেখতে পেতেন। এজন্য ওই আমলে পুলিশ পর্যন্ত তাঁর সাহায্য নিত। আমিও কিছু-কিছু গুণ তাঁর পেয়েছিলাম, কিন্তু সে খুবই কম, তার উপরে বয়সটাও হয়েছে, যে কোনওদিনই দুনিয়া ছাড়ব-ছাড়ব একটা ভাব এসেছে, এখন আমার উচিত প্রত্যেককেই ক্ষমা করে দেওয়া। তোমাকেও আমি ক্ষমাই করতাম। ক্ষমা করবই ভেবেছিলাম, কিন্তু কবিরাজি শাস্ত্রে আর সব আছে, ক্ষমা নেই। তোমার চিকিৎসা তিন মাস আমি করব না। এ-শাস্তি অপরাধের তুলনায় অল্পই। নিলুজ্যাঠা হলে এর শাস্তি হত দু' বছর। আমার মন নরম, তার উপর তোমার অপরাধও এই প্রথম, তাই তিন মাস সাজাই রইল। ভয় কী, দেখতে-দেখতে কেটে যাবে তিন মাস।"

"আচ্ছা গোবিন্দকাকা!" আদিত্যনারায়ণ বললেন, "আপনার

কথা অমান্য করে আমার ভারী অন্যায় হয়েছে, বুঝতে পারছি। খুবই অন্যায় হয়েছে, এমন অন্যায় আর কখনও হবে না। এবারকার মতো মাফ করতে পারেন না?"

"না।" গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, "এ হুকুম নড়চড় হবার নয়।"

"কে আপনাকে এই খবরটা জানিয়েছে গোবিন্দকাকা?" আদিত্যনারায়ণ বললেন, "নিশ্চয় সে আমার শুভার্থী। আমার ভালর জন্যই করেছে। যাতে আমার শরীর ভাল থাকে সেজন্যই আপনাকে বলেছে।"

গোবিন্দ কবিরাজ চুপ। তিনি জানলা দিয়ে আকাশ দেখছেন।

আদিত্যনারায়ণ এবারে চট করে বললেন, "দীপ আপনাকে যে খবর দিয়েছে সেটা ভালই করেছে। ভাই তো? তাই ভাইয়ের মঙ্গলের জন্যই···।"

কথাটা শ্রেয় আন্দাজেই বলেছিলেন আদিত্যনারায়ণ। আন্দাজে বলেছিলেন, কারণ তাঁর দৃঢ় সন্দেহ, এ-কথা দু'-একজনে জানলেও খবরটা দীপদাই দিয়েছে। আর গোবিন্দ কবিরাজও বোধ হয় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন মুহূর্তের জন্য। তিনি বললেন, "তা সে তোমার মঙ্গলের জন্যই খবর দিয়েছে, ঠিকই বলেছ। সে তোমার শুভার্থী।"

সব জানেন গোবিন্দ কবিরাজ। ওঁদের মধ্যে যে আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক সেটা তিনি ভাল করেই জানেন।

"তা হলে তিন মাস পর দেখা করব ফের।" আদিত্যনারায়ণ বললেন, "যদি আমি বেঁচে থাকি। আপনি তো আমাকে আর চিকিচ্ছে করবেন না।"

"বললাম তো তিন মাস আর কতদিন, দেখতে-দেখতেই কেটে যাবে।" গোবিন্দ কবিরাজ সান্ত্বনা দিলেন।

"কিন্তু বসন্তের গোড়ায় যে প্রতি বছর আমার বাতের ব্যথা বাড়ে, সর্দি-জ্বর হয়, তার তো আর দু' মাস বাকি।"

"সে আমি কী করব।" গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, "সাবধানে থাকবে, ব্যস্‌।"

খুবই বিমর্ষ হয়ে ফিরলেন আদিত্যনারায়ণ। দুশ্চিন্তায় সারারাত ঘুম এল না। শুণ্ডার ঘেউ-ঘেউ বন্ধ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রাতে প্যাঁচারা ডাকে, লক্ষ্মী প্যাঁচা হলে হবে কী, ডাকে ঠিক সরস্বতীর হাঁসের মতো। লক্ষ্মী প্যাঁচা না ছাই, অলক্ষ্মী প্যাঁচা! তার উপর টিকটিকিদের মাঝে-মাঝেই খবরাখবর আদানপ্রদান চলে। হাসি পায় আদিত্যনারায়ণের। একটা টিকটিকি বলে টিক্‌টিক্ টিক্‌টিক্ টিক্‌টিক্ অন্য একটা জবাব দেয় ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্। আরে বাবা, সবই যদি ঠিকঠাক চলে, তবে তো সে ভাল কথা, তা এমন জাহির করে বলার দরকারটা কী? যত্ত সব!

সকালে আদিত্যনারায়ণ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। যদিও রাতে ঘুমটুম তেমন হয়নি তবু তাঁর ভাল লাগল এই ভেবে যে, গোবিন্দ কবিরাজের নির্দেশমতো হাঁটতে হবে না। উনি আদিত্যনারায়ণকে ত্যাগ করেছেন। রোগী হিসেবে তাঁর কোনও মর্যাদা নেই। কিন্তু হাঁটতে হবে না, দৌড়তে হবে না, সাঁতার কাটতে হবে না। আঃ চমৎকার!

আড়াই দিন বেশ গেল। আর মাত্র সাড়ে সাতাশি দিন বাকি। এমন সময় খুব উদ্বেগের সঙ্গে আদিত্যনারায়ণ লক্ষ করলেন, তাঁর বাঁ পায়ের গোড়ালির কাছে একটা ফোড়া হয়েছে। খুব ব্যথা নেই, তবে খুব ভরসাও নেই। ফোড়াটা বড় হবে, পাকবে, তখন দারুণ ব্যথা হবে। বছর তিনেক আগে এরকম একটা ফোড়া তাঁর হয়েছিল, তখন গোবিন্দ কবিরাজ কী একটা সালসা খেতে দিয়েছিলেন, ঘোর সবুজ রঙের সালসা, একটু ঝাল আর কী ঝাঁজ! তাতে তিন দিনে ফোড়া ভাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন তো ভারী মুশকিল। ওষুধ কোত্থেকে পাবেন? ওষুধ কে দেবে তাঁকে?

আরও বিপদ। রাত্রেই তাঁর হল জ্বর। থার্মোমিটার মুখে নিয়ে দেখলেন, জ্বর উঠেছে একশো তিন। আদিত্যনারায়ণ গিন্নি আর ছেলেমেয়েদের বললেন, "বুঝলে, আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। একটা উকিল ডাকো—সুরেন উকিল হলেই ভাল হয়, আমি উইল করব। এতদিন যে কেন উইল করিনি কে জানে?"

এই শুনে গিন্নি তো চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। পাড়ার লোকজন সব এলেন। দীপনারায়ণও এসে হাজির। গোবিন্দ কবিরাজ যে ফতোয়া জারি করেছেন তা শুনে সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। দীপনারায়ণ বললেন, "আমি গোবিন্দ কবিরাজকে রাজি করাবই।"

"না না!" আদিত্যনারায়ণ কাকে যেন বললেন, "দীপদাকে বারণ করো তো গোবিন্দ কবিরাজের কাছে যেতে! আমি মরব, বেশ বুঝতে পারছি। মিছিমিছি সম্মানটা নষ্ট করার দরকার নেই।"

আদিত্যনারায়ণ সরাসরি দীপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কথা বলেননি। দীপেন্দ্রনারায়ণও একজনকে বললেন, "দীপকে বলো তো কবিরাজ নিয়ে ও যেন দুশ্চিন্তা না করে। তা ছাড়া ফোড়া একটা গুরুতর অসুখই নয়, ভাবতে হচ্ছে জ্বরটা নিয়েই।"

"ফোড়া থেকেই জ্বর হয়েছে।" দীপনারায়ণ বললেন, "ফোড়া সারলেই জ্বর সেরে যাবে।"

"কিন্তু গোবিন্দ কবিরাজ আমার চিকিৎসা করবেন না।"

দু' ভাইয়ে এখন মোটামুটি সরাসরিই কথা বলছেন। মধ্যস্থ কেউ নেই সেটা তাঁরা ভুলে গেছেন।

"করাতে হবে," দীপনারায়ণ বললেন।

"অসম্ভব!" আদিত্যনারায়ণ বললেন, "ওঁকে তুমি চেনো না। উনি আমার চিকিৎসা করবেন না।"

"উনি চিকিৎসা করতে বাধ্য হবেন!"

"বাধ্য হবেন না। উনি আসবেন না।"

দীপনারায়ণ বললেন, "না, আসলে ওঁর ঘাড় ধরে···।" তারপর বললেন, "ঘর থেকে সবাই চলে যান তো। আদিত্যর সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত কথা আছে।"

সকলে অবাক। তিরিশ বছর দু'জনের মধ্যে সরাসরি কথা নেই। প্রায় পনেরো মিনিট পর দীপনারায়ণ একটা স্ট্রেচারে করে আদিত্যনারায়ণকে নিয়ে গেলেন গোবিন্দ কবিরাজের মামাতো ভাই শিবেনের বাড়ি। সেখানে আদিত্যনারায়ণকে লেপ মুড়ি দিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল একটা খাটে। পালকি নিয়ে যাওয়া হল গোবিন্দ কবিরাজের বাড়ি। রাত তখন প্রায় এগারোটা। গোবিন্দ কবিরাজের ঘুম আসছিল না। ঘুমের ওষুধেও আর তাঁর ঘুম হয় না। এ-পাশ ও-পাশ করছিলেন। শিবেনের ছেলে শম্ভু গম্ভীরভাবে বলল, "গোবিন্দদাদু, একবার আসুন তো আমাদের বাড়ি, বাবার ভারী জ্বর হয়েছে, পায়ে ফোড়া হয়েছে। একশো তিন ডিগ্রি জ্বর।"

"কী হয়েছে?" গোবিন্দ কবিরাজ প্রশ্ন করলেন।

"জ্বর। একশো তিন ডিগ্রি।"

"আর কী হয়েছে বললি?"

"ফোড়া।"

কত বড় ফোড়া? কতদিন হয়েছে, ব্যথা আছে কি না, ইত্যাদি প্রশ্ন করতে করতে কোনওরকমে গোবিন্দ কবিরাজ গিয়ে পালকিতে উঠলেন। সঙ্গে কয়েকটা ওষুধও নিলেন। গোবিন্দ কবিরাজ রাত্রিবেলা ভাল দেখতে পান না। তা ছাড়া লণ্ঠনের আলোও ইচ্ছে করেই কমজোরি করে রাখা হয়েছে। দিনেরবেলা হলে এ-কৌশল খাটবে না জেনেই রাত্রিবেলা এই বন্দোবস্ত করেছেন আদিত্যনারায়ণ।

বন্দোবস্ত কিংবা ষড়যন্ত্র।

গোবিন্দ কবিরাজ নানাভাবে পরীক্ষা করলেন রোগীকে। নাড়ি দেখলেন, বুকের উপর কান পেতে কী শুনলেন। আদিত্যনারায়ণের মুখ তখনও ঢাকা। গোবিন্দ কবিরাজ প্রশ্ন করলে গোঁগোঁ করে জবাব দেন। মুখের ঢাকা আর খোলেন না।

যাক, ভালয়-ভালয় সব মিটে গেল। গোবিন্দ কবিরাজ দুটো ওষুধ দিলেন, বাকি ওষুধ সকালে গেলেই পাওয়া যাবে বললেন।

কেবল পালকিতে উঠবার সময় বললেন, "শিবেন বিচ্ছুটা কোথায় লুকিয়ে আছে, অ্যাঁ ?"

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। শম্ভু বলল, "বাবাকে তো আপনি দেখলেন শুয়ে আছেন। জ্বর হয়েছে, পায়ে ফোড়া হয়েছে !"

"উঃ কী সাঙ্ঘাতিক !" গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, "মিথ্যেবাদীর দল ! আমি শিবেনের নাড়ি চিনি না ? আটান্ন বছরের নাড়িকে পঞ্চান্ন বছরের নাড়ি বলে চালানো আমি বুঝতে পারব না ভেবেছিস শিবেন ? লেপের তলায় যে আছে তাকে আমি চিনি না ? আমি কি জানি না আমাকে ফাঁকি দিয়ে শিবেন সেজে যে শুয়ে আছে সে আদিত্যনারায়ণ ? ও নাড়ির ধুকপুকানি আর কার হবে ? মনে ভয়, আশঙ্কা, আতঙ্ক সব মিশে একাকার হয়ে গেছে ধরা পড়ার ভয়ে।"

শিবেন কোথায় লুকিয়ে ছিল, সে এসে মুখ নিচু করে দাঁড়াল। বলল, "দাদা, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি ক্ষমা করলেন তো আমাদের ?"

"আমাদের ?" গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, "আমাদের মানে ? এই ষড়যন্ত্র তো সকলে করেনি, করেছে একজনই। একজনের মাথা থেকেই এটা বেরিয়েছে। সে শয়তানটাকে তো দেখতে পাচ্ছি না !"

"আজ্ঞে, খুবই ভুল হয়ে গেছে।" শিবেন বললেন, "খুবই ভুল হয়ে গেছে, তবে যখন মানুষ মরবার দাখিল হয় তখন কি আর সব দিক বজায় রাখা যায় ? এই কারণেই দীপনারায়ণবাবু তাঁর ভাইকে বাঁচাতেই এই কাজ করেছেন। তা ছাড়া আপনিও এর জন্য দায়ী।"

"আমি দায়ী ?" গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, তারপর খকখক করে কাশতে-কাশতে বললেন, "আমি দায়ী হলাম কেমন করে ?"

"আজ্ঞে, আপনিই তো তিনমাস চিকিৎসা করবেন না বলেছেন। এটা কি ঠিক করেছিলেন, আপনিই বলুন ? একটা লোক মরে যাচ্ছিলেন, আপনি না এলে মরেই যেতেন।"

"মরে যেতেন না ছাই !" গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, "এমন কিচ্ছুই হয়নি আদিত্যনারায়ণের। ও জ্বর কিচ্ছু না। ও এখনও পনেরো বছর বাঁচবে। আমাকে এভাবে ফাঁকি দিয়ে আনার কোনওই প্রয়োজন ছিল না। তবে দু'-দশ দিন ভুগত ঠিকই। ভোগাই উচিত ছিল ওর !"

পালকি নিয়ে বেহারারা চলল। মনে-মনে গোবিন্দ কবিরাজ খুশিই হলেন। না, আজ রাতটায় ঘুম ভালই হবে। মন ভাল থাকলে তাঁর ঘুম ভালই হয়, আর মন খারাপ থাকলে ঘুম যেন আসতেই চায় না।

খক-খক-খক ! গোবিন্দ কবিরাজ কাশতে লাগলেন। এই অসুখটা কেমন করে সারানো যায় ভাবতে ভাবতে পালকিতেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

ছবি : দেবাশিস দেব

সুমেরু সাগর পাড়ি

সুমেরু সাগরের ওপর দিয়ে প্রথম পাড়ি দেন চারজন ব্রিটন। তাঁদের সঙ্গে ছিল স্লেজ এবং সুমেরু অঞ্চলের কুকুর হাস্কি। নেতা ওয়ালি হার্বার্ট-এর (৩৪) সঙ্গে ছিলেন মেজর কেনেথ হেজেস (৩৪), অ্যালান গিল (৩৮) এবং ডঃ রয় কোয়ার্নার (৩৬)।

সচল, নতুন জমাট-বাঁধা বরফের ওপর দিয়ে প্রথম পর্যায়ে ৮০ মাইল পথ পার হয়ে সুমেরুর মূল বরফের চাঁইতে পৌঁছবার জন্য তাঁরা ১৯৬৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আলাস্কার পয়েন্ট ব্যারো থেকে যাত্রা করেন। কিন্তু বিপজ্জনক সচল বরফের অঞ্চল আরও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং বরফের স্তর এতটা পুরু ছিল, যা কোনও মতে স্লেজের ভার সইতে পারে। ৪ জুলাই তাঁরা এক ভাসমান বরফের চাঁই-এর ওপর তাঁবু খাটিয়ে গ্রীষ্মে বরফ-গলা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসে রইলেন। ৪ সেপ্টেম্বর তাঁরা আবার চলতে শুরু করলেন, কিন্তু পড়ে গিয়ে গিলের হাড়ের একটি চাকতি সরে গেল। তাঁরা তাঁদের গ্রীষ্মের তাঁবুতে ফিরে গিয়ে গিলের আরোগ্যের অপেক্ষায় সেখানে শীত কাটাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু বরফের এই চাঁইটি ভেঙে গেলে তাঁদের অন্য একটি চাঁইতে সরে যেতে হল।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আবার যাত্রা শুরু করে ৬ এপ্রিল তাঁরা সুমেরুতে পৌঁছলেন এবং অবশেষে ২৯ মে। স্পিটস্‌বার্গেন-এর তাভলয়া-তে মাটিতে পা রাখলেন।

ধারাবাহিক উপন্যাস

উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পর্ব

এর পর দশটি বছর পার হয়ে গেছে।

এর মধ্যে নদী দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। পৃথিবীতে শুকিয়ে গেছে অনেক গাছ, আবার জন্মেছে অনেক নতুন বৃক্ষ-লতা। যারা শিশু ছিল, তারা কিশোর হয়েছে। কিশোররা পৌঁছেছে যৌবনে। অনেক যুবক-যুবতী প্রৌঢ় হয়েছে, প্রৌঢ়রা হয়েছে বৃদ্ধ, আবার তাদের বংশে এসেছে নতুন শিশু।

রাজকুমার দৃঢ় এখন রীতিমতন যুবক, আর রাজকুমার তীক্ষ্ণ এসে পৌঁছেছে কৈশোরের শেষ দিনে। ছন্তী ছিলেন রাজপুরোহিত, এখন এ-রাজ্যের পুরোপুরি রাজা, তিনি প্রৌঢ় হয়েছেন বটে কিন্তু তাঁর চেহারা দেখলে বোঝা যায় না। তাঁর শরীর আগের চেয়েও সবল হয়েছে, প্রতিদিন তিনি ব্যায়াম ও অস্ত্রচালনা করেন।

রানি তলতাদেবী আজও অন্ধকার কারাগারে বন্দিনী। এই দশ বছরের মধ্যে তাঁকে বাইরের কেউ দেখেনি। একজন প্রহরী তাঁকে খাবার দিতে যায়, আর ছন্তী মাঝে-মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। কিন্তু সেই সময় কারাগারের মধ্যে ছন্তী মশাল জ্বালা হলেও তলতাদেবী দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে রাখেন, তিনি ছন্তীর মুখ দেখতে চান না। নিজের মুখও দেখাতে চান না।

রাজকুমার দৃঢ়ও সূর্যের আলো দেখতে পায় না। কালাঘর দুর্গেরই অন্য এক প্রান্তে তাকে রাখা হয়েছে আর-একটা অন্ধকার ঘরে। সে জানে না তার মা কোথায়, তার ছোট ভাই কোথায়। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সে একা ওই ঘরে রয়েছে, তবু সে মনের জোর হারায়নি।

দু' বছর আগে রাজকুমার দৃঢ় একবার পালাবার চেষ্টা করেছিল। প্রথম-প্রথম তাকে খাবার দিতে আসত একজন প্রহরী। বয়েস বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রহরীর সংখ্যা বেড়ে হল দু'জন। উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে তারা আসে, রাজকুমার তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেও তারা কোনও উত্তর দেয় না।

একদিন রাজকুমার দৃঢ় জ্বরে পড়ল। বিছানা থেকে আর ওঠে না, খাবারও খায় না। প্রহরীরা খাবার রেখে যায়, আবার সেই খাবার-ভর্তি পাত্র ফেরত নিয়ে যায়। এইরকম চলল তিনদিন।

প্রহরীরা সেদিন এসে দেখল, রাজকুমার দৃঢ় এমনভাবে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে যে বেঁচে আছে কি না বোঝা যায় না। প্রহরী দু'জন চিন্তায় পড়ে গেল। তারপর একজন মুখের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখল। গা বেশ গরম। তখন সে একটা ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই, তুমি কিছু খাচ্ছ না কেন?"

দু-তিনবার প্রশ্ন করেও কোনও উত্তর পেল না।

তখন তারা ধরে নিল যে, রাজকুমার জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে গেছে। এর পর যদি চিকিৎসা না করা যায়, তা হলে সে মরেই যাবে। এরকমভাবে তাকে মরতে দেওয়া উচিত কি না, বুঝতে পারল না তারা।

একজন রাজকুমার দৃঢ়র পাশে রইল, আর-একজন গেল রাজবাড়িতে খবর পাঠাতে।

দ্বিতীয় প্রহরীটি বেরিয়ে যাবার একটুক্ষণ পরেই রাজকুমার দৃঢ় তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চেপে ধরল অন্য প্রহরীটির কণ্ঠ। বাঘ যেমন মোষের টুঁটি কামড়ে ধরে আর কিছুতেই ছাড়ে না, রাজকুমার

আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্পনা ধরো

তোমাদের আঁকার পাতায় ত্রিভুজ এবং বৃত্ত দিয়ে এবার কী আঁকার কথা ভেবেছি, তোমরা কল্পনা ধরো। পরে মিলিয়ে নিও।

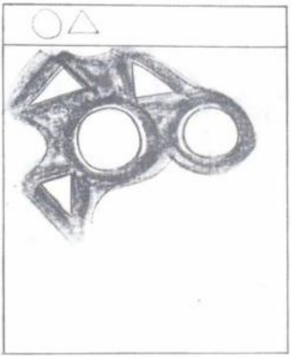

হাসিখুশি — শতদল

বুবুন রেজাল্ট নিয়ে বাড়িতে ফেরবার পর তার বাবা তাকে খুব বকলেন। বললেন, "তোমার লজ্জা করে না, তুমি ক্লাসের আঠাশজন ছেলের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ফল করেছ ?" বুবুন উত্তর দিল, "এটা তেমন কিছু খারাপ হয়নি, বাবা !"
বাবা : তার মানে ?
বুবুন : মনে করো ক্লাসে যদি পঞ্চাশজন ছেলে থাকত !

রিমি স্কুল থেকে ফিরে এসে তার মাকে হাসতে হাসতে বলল, "জানো মা, আমাদের অঙ্কের দিদিমণির মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কালকে উনি শেখালেন চার আর এক যোগ করলে পাঁচ হয় আর আজ বললেন তিন আর দুই যোগ করলে পাঁচ হয়।"

শিক্ষক : গতকাল তুমি ইস্কুলে যা দুষ্টুমি করেছ তার জন্য তোমার বাবা নিশ্চয় তোমাকে খুব মেরেছেন।
বুবুনের উত্তর : 'না মাস্টারমশাই, বাবা আমাকে একটুও মারেননি, উনি বলেছেন যে, আমাকে মারতে গেলে ওঁর অনেক বেশি কষ্ট হবে।
শিক্ষক : তোমার বাবা তোমার প্রতি অত্যধিক সহানুভূতিশীল।'
বুবুন : তা কেন হবে, বাবা যে বাতের ব্যথায় হাত দুটো নাড়াতেই পারেন না।

ছাত্র : আচ্ছা মাস্টারমশাই, যে মানুষ যে কাজ করেনি তার জন্য কি তার শাস্তি পাওয়া উচিত ?
শিক্ষক : না, তা কখনওই পাওয়া উচিত নয়।
ছাত্র : আমি আজ অঙ্কগুলি করে আনিনি।

দৃঢ়ও কিছুতেই ছাড়ল না তাকে। সে লোকটি হাতের তলোয়ার চালাবারও সুযোগ পেল না, গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল কয়েক মুহূর্ত পরেই।

রাজকুমার দৃঢ় হাতে তুলে নিল তলোয়ার। দরজা খোলা। পালাবার এই তো দারুণ সুযোগ। সামনেই মুক্তি।

তবু সেবার রাজকুমার দৃঢ় পালাতে পারেনি। কারও হাতে সে ধরাও পড়েনি অনেকটা সময়, তা হলেও তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল এই অন্ধকার কারাগারে।

সেদিন তলোয়ার হাতে নিয়ে রাজকুমার দৃঢ় বেরিয়ে এসেছিল তার ঘর থেকে। খানিকটা অলিন্দের পর সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নেমেও এসেছিল অনেকটা, আর-একজন প্রহরীর চোখ এড়িয়ে সে চলে এসেছিল এই বন্দিশালার প্রধান দ্বারের কাছে। কিন্তু দুর্গের বাইরে পা দিয়েই সে চিৎকার করে উঠেছিল যন্ত্রণায় !

আট বছর ধরে রাজকুমার দৃঢ় একটুও সূর্যের আলো দেখেনি। অন্ধকারে থাকতে থাকতে তার চোখে অন্ধকার সয়ে গিয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যেও সে একটু-একটু দেখতে পায়। কিন্তু রোদ সে সহ্য করতে পারল না। দারুণ যন্ত্রণায় সে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। তার চিৎকার শুনে প্রহরীরা এসে তাকে আবার তুলে নিয়ে রেখে এসেছিল কারাগারে।

সে সংবাদ শুনে ছন্তী খুব হেসেছিলেন।

এমন ব্যবস্থা তিনি করেছেন যে, প্রহরীরা অমনোযোগী হলেও রাজকুমার পালাতে পারবে না। সারাজীবন তাকে অন্ধকারেই কাটাতে হবে !

রাজকুমার তীক্ষ্ণর অবস্থা অবশ্য অন্যরকম। ছন্তী তাকে খুব ভালবাসেন, তীক্ষ্ণ তাঁর দু'চোখের মণি। সব সময় তিনি তীক্ষ্ণকে নিজের কাছে কাছে রাখেন। তীক্ষ্ণকে তিনি লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। অস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণ পূজারী হলেও ছন্তী অস্ত্রচালনাও ভাল জানেন। প্রত্যেকদিন খানিকক্ষণ অস্ত্রচর্চাও করেন।

রাজসভাতেও ছন্তী নিয়ে যান তীক্ষ্ণকে। তাকে রাজকার্য শেখাচ্ছেন। ভবিষ্যতে তীক্ষ্ণকেই তিনি সিংহাসনে বসাবেন। ছন্তী বিয়ে করেননি, তাঁর আর কেউ নেই। তীক্ষ্ণকে তিনি নিজের ছেলের মতনই মনে করেন। রাজবাড়ির নিয়ম অনুযায়ী রাজকুমার তীক্ষ্ণ রাজপুরোহিত ছন্তীকে গুরুদেব বলে ডাকে। ছন্তী বারবার বলেন, আমাকে গুরুদেব বলিস না, আমাকে বাবা বলে ডাকবি ! তোর বাবা বেঁচে নেই, তোর মা তোর স্নেহময় বাবাকে খুন করছে। ওরকম মায়ের কথা মনে রাখতে নেই।

তীক্ষ্ণ অবশ্য এখনও ছন্তীকে বাবা বলে না, গুরুদেবই বলে।

এত বছর কেটে গেছে, তীক্ষ্ণর এখন আর বাবা-মায়ের মুখ ভাল করে মনেই পড়ে না। তার মা তার বাবাকে হত্যা করেছে। এই কথাটা শুনলেই তার ঘৃণা হয় ! ওই মাকে সে আর কোনওদিন দেখতে চায় না।

তীক্ষ্ণর চেহারা খুব সুন্দর হয়েছে। ছিপছিপে লম্বা, চোখা নাক। কিন্তু তার চোখে সব সময় যেন একটা অন্যমনস্ক ভাব। তার অস্ত্রশিক্ষক মামোজি মাঝে-মাঝে অনুযোগ করে বলেন, "এই রাজকুমার তো ইচ্ছে করলেই মহাবীর হতে পারে, কিন্তু সব সময় যে মন দিয়ে লড়াই করে না ! এক-এক সময় হাত থেকে তলোয়ার ফেলে দেয় !"

ছন্তী রাজকুমার তীক্ষ্ণকে সব জায়গায় নিজের সঙ্গে নিয়ে যান। শুধু এক জায়গায় ছাড়া। মাঝে-মাঝে তিনি কালাঘর দুর্গে রানি তলতাদেবীকে দেখতে আসেন, তখন তিনি তীক্ষ্ণকে রেখে আসেন

রাজবাড়িতে।

কালাঘর দুর্গে এসে, একটার-পর-একটা কক্ষ পেরিয়ে চলে আসেন রানি তলতাদেবীর কক্ষে। একজন প্রহরী মশাল জ্বালিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ায়।

তলতাদেবী ঘরের এক কোণে সরে গিয়ে দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে রইলেন। দেওয়ালের দিকে মুখ করে বললেন, "নমস্কার, গুরুদেব।"

ছন্তী হেসে উঠে বললেন, "এখনও তুমি আমাকে প্রণাম জানাচ্ছ? আমি তোমাকে এমন শাস্তি দিয়েছি, তবু তোমার রাগ হয় না?"

তলতাদেবী বললেন, "আমি এ-রাজ্যের রানি, আমি রাজপুরোহিতকে প্রণাম জানাব না? আপনি আমাকে যে শাস্তি দিয়েছেন, সেটা আপনার ব্যাপার! তা বলে তো আমি আমাদের পরিবারের রীতি অমান্য করতে পারি না!"

ছন্তী আরও জোরে হেসে উঠে বললেন, "তুমি এখনও নিজেকে এ-রাজ্যের রানি মনে করো? হায় রে! এ-রাজ্যের মানুষ তোমার নামই ভুলে গেছে। এ-রাজ্যের রাজা এখন আমি! তলতাদেবী, তোমার রাজত্ব এখন শুধু এই অন্ধকার ঘরটুকু! ওই ছেঁড়া কম্বলটা তোমার সিংহাসন!"

তলতাদেবী বললেন, "গুরুদেব, আপনি বলছেন, আপনিই এখন এ-রাজ্যের রাজা। আপনি মহা শক্তিমান। তবু মাঝে-মাঝে আপনাকে আসতে হয় আমার কাছে। আমি আপনার মুখ দেখি না, তবু আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। তাতেই প্রমাণ হচ্ছে, আমি আপনার চেয়ে বড়!"

ছন্তী বলল, "তোমার তেজ দেখছি এখনও একটুও কমেনি! ভাল, তেজ থাকা ভাল! শোনো, তলতাদেবী, তোমাকে আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। তোমার এখনও এ-রাজ্যের রানি থাকার শখ। তুমি রানি হতে পারো, যদি তুমি আমাকে বিয়ে করো!"

তলতাদেবী এতই অবাক হলেন যে, কয়েক মুহূর্ত কথাই বলতে পারলেন না।

তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "আপনি এখনও এমন একটা অদ্ভুত কথা বলতে পারছেন? কোনও রানি কি কখনও কোনও পুরোহিতকে বিয়ে করতে পারে?"

ছন্তী বললেন, "কেন বারবার আমাকে পুরোহিত বলছ? আমি এখন রাজা। চারপাশের অন্যান্য রাজ্যও আমাকে শক্তিমান রাজা বলে স্বীকার করে। কেউ এ-রাজ্য আক্রমণ করতে সাহস পায় না। অনেক ব্রাহ্মণও রাজা হয়, তাদের সঙ্গে রাজকুমারীদের বিয়ে হয়! এখনও বলো, তুমি রাজি কি না!"

তলতাদেবী বললেন, "আমি সত্যিই আপনার কথার মানে বুঝতে পারছি না। আপনি আমার সর্বনাশ করেছেন। আপনি আমার স্বামীকে হত্যা করেছেন, আমার ছেলেদের কেড়ে নিয়েছেন। আমার জীবনের দশটি বছর অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছেন। তারপরেও আপনি আমাকে বিয়ে করতে চান? আমি যদি রাজিও হই, তা হলে প্রথমেই তো প্রতিশোধ নিতে চাইব। প্রথম দিনেই আপনাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলব।"

ছন্তী অট্টহাস্য করে বললেন, "সে-কথা কি আমি জানি না? তুমি প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে, আর আমি প্রত্যেকবারই তোমার ষড়যন্ত্র ধরে ফেলব। বুদ্ধির খেলায় তুমি প্রত্যেকবার আমার কাছে হারবে। সেইটাই তো মজা! তুমি যে এখন কারাগারে রয়েছ, তা প্রজারা জানে না। আমি চাই, প্রজারা সবাই দেখুক, এককালের সেই অহঙ্কারী রানি তলতাদেবী আমার রানি হয়েছে, আমার বুদ্ধির কাছে সে বশ মেনেছে!"

তলতাদেবী বললেন, "আপনাকে সেই মজা পেতে দিতে আমি রাজি নই। তবে, জেনে রাখবেন, প্রতিশোধ আমি নেবই!"

ছন্তী বললেন, "তুমি কোনওক্রমেই এই কারাগার থেকে বেরোতে পারবে না!"

তলতাদেবী বললেন, "আমি না পারি, আমার ছেলেরা প্রতিশোধ নেবে। মায়ের অপমান, পিতৃহত্যা তারা ভুলবে না!"

ছন্তী বললেন, "তোমার সে আশা দুরাশা। তোমার এক ছেলে তোমায় ঘৃণা করে। সে কোনওদিন তোমার মুখ দর্শন করবে না। আর-এক ছেলে অন্ধকার ছাড়া আলোতেই আসতে পারবে না কোনওদিন! যতদিন বাঁচবে, তুমি এই অন্ধকার নরকেই থাকবে। আমি মাঝে-মাঝে এসে তোমার অবস্থা দেখে যাব!"

এই বলে বেরিয়ে এলেন ছন্তী। তলতাদেবীর তেজ দেখতে তাঁর ভাল লাগে। তিনি দেখতে চান, এই তেজ কতদিন বজায় থাকে। এই নারী কোনওদিনই তাঁর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

পরদিনই কিন্তু ছন্তী একটা দুঃসংবাদ পেলেন। (ক্রমশ)

ছবি: সুব্রত চৌধুরী

মরণাপন্ন গাছের কান্না

এই কান্নার শব্দ হয়তো আমরা শুনতে পাব না : অসুস্থ, মরণাপন্ন একটি গাছ অসহায় অবস্থায়

চিৎকার করছে। কিন্তু একদল বিজ্ঞানী এই চিৎকার শুনেছেন, এবং তাঁদের ধারণা, বেশ কিছু পোকামাকড়ও এই চিৎকার শুনতে পায়। তারপর শকুনের মতো তারা ধেয়ে আসে মরণাপন্ন গাছটির দিকে।

খরায় কবলিত গাছের বাকলে সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন অনেক সংবেদক লাগিয়ে দিয়েছিলেন মার্কিন কৃষি সংস্থার বনবিভাগের গবেষকরা, এবং গাছের আর্ত চিৎকার তাঁরা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছেন। বনবিভাগের পতঙ্গবিজ্ঞানী রবার্ট হ্যাক বলেছেন, 'গাছেরা তাদের দুর্দশার কথা জানায় ৫০ থেকে ৫০০ কিলোহার্জ কম্পাঙ্কে।" কম্পাঙ্ক ২০ কিলোহার্জের চেয়ে বেশি হলে আমরা তা শুনতে পাই না। হ্যাক আরও বলেছেন, "বিভিন্ন গাছের চিৎকারের ধরন বিভিন্ন। আর এই চিৎকারগুলো আসলে কাঠের কম্পন। যদি রেকর্ড করার গতি কমিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে শব্দগুলো পাখির কিচিরমিচিরের মতো শোনাবে।"

বিজ্ঞানীদের ধারণা, জলের অভাব দেখা দিলে গাছের কাণ্ডের ভেতরে যে-জলবাহী নল রয়েছে সেগুলো ভেঙে যায়। তার ফলেই নির্দিষ্ট কম্পনের সংকেত পাওয়া যায়। কিছু কিছু পোকামাকড় শব্দোত্তর তরঙ্গে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে। যেমন, বার্ক বিট্‌ল। তারা হয়তো গাছের এই কম্পন শুনতে পেয়ে মৃতপ্রায় গাছটিকে আক্রমণ করে। তবে এ-কথা ঠিক যে, জলাভাবে মৃতপ্রায় গাছের গন্ধও আলাদা, এবং তাদের মধ্যে তাপগত পরিবর্তন ঘটে।

যে সুতির পোশাকে ভাঁজ পড়ে না

ইদানীং বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি সুতির পোশাক চোখে পড়ে যা কাচার পরে ইস্তিরি করতে হয় না। এইসব পোশাকের কাপড় তৈরির সময় ব্যবহার করতে হয় ফরম্যালডিহাইড। এর ফলে একবার যে-ইস্তিরি করা হয় তা একেবারে স্থায়ী হয়ে যায়—অনেকটা টেরিকটনের কাপড়ের মতো, কিন্তু সমস্যা হল ফরম্যালডিহাইড ব্যবহার করা নিয়ে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ফরম্যালডিহাইডের জন্য ল্যাবরেটরির প্রাণীদের মধ্যে ক্যান্সার রোগ বাসা বেঁধেছে। ফলে মার্কিন মুলুকে খুব শিগগিরই হয়তো পোশাকের কাপড়ে ফরম্যাল ডিহাইডের ব্যবহার নিয়ে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি হবে। এই কারণেই বস্ত্রশিল্পে ফরম্যালডিহাইডের বিকল্প নিয়ে খোঁজ-খোঁজ রব পড়ে গিয়েছে। এই বিকল্পটি হতে হবে দামে শস্তা অথচ ব্যবহারের পক্ষে নিরাপদ।

নিউ অরলিন্স-এর মার্কিন কৃষিবিভাগ তাদের সাম্প্রতিক গবেষণায় এই সমস্যা সমাধানের খানিকটা হদিস পেয়েছেন। এই বিভাগের গবেষকরা দেখেছেন, সুতোর আঁশের সঙ্গে এক ধরনের দুর্বল অ্যাসিড জাতীয় রাসায়নিক মিশিয়ে দিতে পারলে সেই সুতোয় তৈরি কাপড় একবারের বেশি ইস্তিরি করার প্রয়োজন হয় না। এই কাজ করতে পারে চারটি ভিন্ন শ্রেণীর অনুঘটক। অণুঘটকগুলোর মধ্যে রয়েছে ফসফরাসযুক্ত ক্ষারীয় ধাতব লবণ। পরীক্ষামূলকভাবে কৃষিবিভাগের গবেষকরা সুতির কাপড় একবার দুর্বল অ্যাসিডে এবং আর একবার অণুঘটকের দ্রবণে ডুবিয়ে সেটিকে ৪১০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে

দেখেছেন কাপড়টির মধ্যে বিশেষ ধর্মটি পাওয়া যাচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত এর সমস্যা হচ্ছে খরচ। এই পদ্ধতিতে খরচ এত বেশি পড়ছে যে বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো এই রাসায়নিক ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। তাদের আশ্বাস দিতে কৃষিবিভাগ জানিয়েছে বছরখানেকের মধ্যেই তারা এই পদ্ধতির খরচ অনেক কমিয়ে ফেলতে পারবে। তখনই পাওয়া যাবে ফরম্যালডিহাইডের আদর্শ বিকল্প।

ফিল্ম ছাড়াই এক্স-রে ছবি

এক্স-রে ছবি তোলার এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে পশ্চিম জার্মানির সিমেন্স কম্পানি। এই পদ্ধতিতে সাধারণ ফোটোগ্রাফিক ফিল্মের বদলে ব্যবহার করা হয়েছে 'ডিজিটাল মেমারি ফয়েল'।

'ডিজিস্ক্যান' নামের এই পদ্ধতির সাহায্যে তৈরি যন্ত্রটিকে গত দু' বছর ধরে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে চিকিৎসার নানা কাজে। এই যন্ত্রে শুধু যে রুগির এক্স-রে ছবি পাওয়া যাবে তা নয়, বরং রেডিওলজিস্ট ছবিটিকে নিয়ে তাঁর ইচ্ছেমতো কারিকুরি করতে পারেন। যেমন, ছবির অপ্রয়োজনীয় অংশকে ঢেকে দেওয়া, গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম অংশকে খুশিমতো এনলার্জ করা, অথবা ছবির কোনও-কোনও অংশকে পর-পর ধারাবাহিকভাবে দেখার কাজ—সবই সম্ভব এই ডিজিস্ক্যান যন্ত্রে। সোজা কথায়, সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য এক্স-রে ছবিকে যতটা খুঁটিয়ে দেখা দরকার, তার সবরকম ব্যবস্থাই রয়েছে এর মধ্যে। ডিজিস্ক্যানে ছবি গ্রহণের জন্য যে ধাতুপাত ব্যবহার করা হয় তার ওপরে থাকে সংদীপ্ত পদার্থের

নিউ ইয়র্কের সোহো অঞ্চ

হলোগ্রাফির জাদুঘর

গত কয়েক বছরে শিল্পকলার কাজে হলোগ্রাফি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পত্রিকার প্রচ্ছদ, বইয়ের ছবি, স্টিকার, তাস, এমনকী মহিলাদের লকেটেও জায়গা করে নিয়েছে লেসার রশ্মির সাহায্যে তৈরি রঙিন ত্রিমাত্রিক ছবি—যাকে বলা হয় হলোগ্রাম। এ ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে হলোগ্রাফির ব্যবহার তো প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। যেমন, গাড়ি বা এরোপ্লেনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ খুঁটিয়ে পরীক্ষার কাজে, সুপারমার্কেট থেকে কেনা জিনিসপত্রের 'বার কোড' পড়ার কাজে, কোনও কেলাসের মধ্যে বিভিন্ন পরমাণুর অবস্থান দেখার ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করা

নিউ ইয়র্কের সোহো অঞ্চলে উনিশ শতকের একটি প্রাসাদোপম বাড়িতে ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মিউজিয়াম অব হলোগ্রাফি'। বর্তমানে এই জাদুঘরের সঞ্চয়ে রয়েছে দেড়

আস্তরণ। একটি লেসার রশ্মিপুঞ্জ সেই ছবির প্রতিটি বিন্দু ছুঁয়ে যায় এবং এই ক্রমবীক্ষণের ফলাফল ডিজিটাল সঙ্কেত হিসাবে ইলেকট্রনিক মেমারিতে সঞ্চয় করে রাখে। তারপর সেখান থেকে যখন খুশি, যতবার খুশি সেই 'এক্স-রে ছবি' দেখা যেতে পারে। ডিজিটাল তথ্যকে 'সাধারণ এক্স-রে ছবিতে' রূপান্তরিত করে একটি কম্পিউটার এবং রূপান্তরিত ছবিটি ভেসে ওঠে কম্পিউটারের টিভি পরদায়। একটি ডিজিটাল মেমারি ফয়েল ইউনিটকে কয়েক হাজারবার নিশ্চিন্তে ব্যবহার করা যায়। আর সাধারণ এক্স-রে যন্ত্রকে কোনওরকম পরিবর্তন না করেই ডিজিস্ক্যানের সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব। নতুন যে অংশটি বাড়তি দরকার, তা হল কম্পিউটার ও ইমেজ প্রসেসিং ইউনিট।

টেলিফোনের মাধ্যমে ফ্যাক্সের সুবিধে

'ফ্যাক্স' পদ্ধতি সারা পৃথিবীতে এখন যথেষ্ট জনপ্রিয়। ফ্যাক্সের সাহায্যে নকশা, নথি, ছবি, চিঠি ইত্যাদির কপি চোখের নিমেষে চালান হয়ে যায় দুস্তর ব্যবধানে। যেসব কাজের মানুষ পায়ের তলায় সরষে লাগিয়ে পৃথিবী চষে বেড়ানোর সময়েও ফ্যাক্সের সুবিধে চান, তাঁদের জন্য চালু হয়েছে অভিনব ফ্যাক্স যন্ত্র 'মোবিলফ্যাক্স'। ব্রিফকেসে এঁটে-যাওয়া খুদে যন্ত্র মোবিলফ্যাক্স নিয়ে কাজ করা যায় যেখানে-সেখানে। শুধু একটা টেলিফোন আর প্লাগ পয়েন্ট থাকলেই হল। একটা প্রমাণ সাইজের পৃষ্ঠার কপি পাঠাতে এর

সময় লাগে তিরিশ সেকেণ্ডেরও কম। আর তথ্য প্রেরণের গতিবেগ হল প্রতি সেকেণ্ডে ন' হাজার ছশো 'বিট'। ফোটোগ্রাফের কপি পাঠানোর জন্য ষোলোটি ভিন্ন মাত্রার ছাই রং ব্যবহার করা হয়। আর-এক সঙ্গে পাঁচ পৃষ্ঠা তথ্য পাঠানো যেতে পারে এই যন্ত্রের সাহায্যে। অন্য ফ্যাক্স মেশিন থেকে আসা তথ্য ছাপানোর জন্য একশো পৃষ্ঠা কাগজও রাখার ব্যবস্থা রয়েছে মোবিলফ্যাক্সের ব্রিফকেসে।

উনিশ শতকের একটি প্রাসাদোপম বাড়িতে ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মিউজিয়াম অব হলোগ্রাফি'।

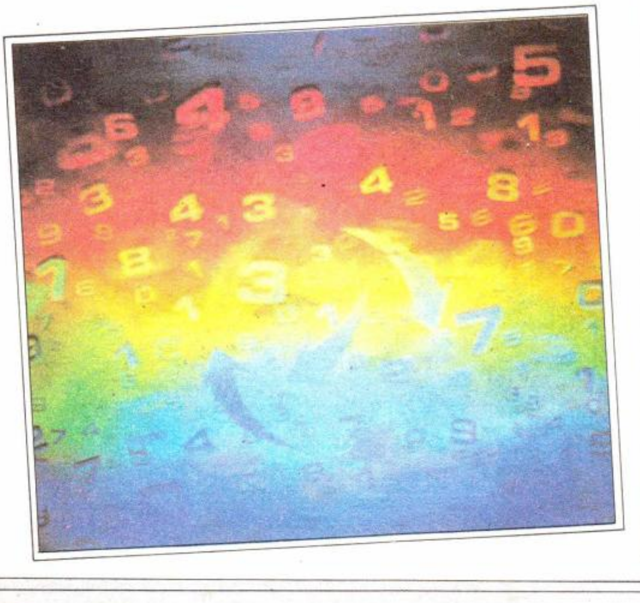

হাজারেরও বেশি হলোগ্রামের সেরা সংগ্রহ। এ ছাড়া এখানে রয়েছে দুটি প্রদর্শনীকক্ষ, একটি পরীক্ষাগার, শিক্ষাদানের সুযোগ-সুবিধে ও একটি পাঠাগার। প্রদর্শনীর মূল আকর্ষণ 'ইন পারস্পেকটিভ' নামে হলোগ্রাফির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সুচারু লেখা ও হলোগ্রামের সাহায্যে এই ইতিহাস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সম্প্রতি জাদুঘর কর্তৃপক্ষ তাঁদের নতুন কীর্তি স্থাপন করেছেন। বিখ্যাত কয়েকজন নিউ ইয়র্কবাসী ক্রীড়াবিদের হলোগ্রাফিক প্রতিকৃতি নিয়ে 'মেকিং ফেসেস' নামে একটি অভিনব প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন তাঁরা। এই প্রদর্শনী শুরু হয়েছে গত ১৯৮৯-এর অক্টোবর। চার-মাস ধরে চলবে এই প্রদর্শনী। সুতরাং হলোগ্রাফি বিজ্ঞান ও শিল্পকলাকে একই সুতোয় গেঁথে দিয়েছে। ছবিতে সংখ্যা নিয়ে তৈরি একটি হলোগ্রাফিক শিল্প দেখা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, এই হলোগ্রাফটি 'মিউজিয়াম অব হলোগ্রাফি'রই সংগ্রহ।

প্রযুক্তিবিজ্ঞান

স্কুলের কম্পিউটার

স্কুলে কম্পিউটার এসে শিক্ষাজগতে কীভাবে নতুন যুগের সূচনা করেছে জানিয়েছেন **পবিত্রকুমার চক্রবর্তী**।

এখন বহু স্কুলে কম্পিউটার এসে গেছে। অনেকেই জিনিসটাকে সামনে থেকে দেখেছ। কিন্তু অধিকাংশের কাছেই ব্যাপারটা এখনও রহস্যে ঢাকা। স্কুলে একটা ঘরের দরজার ওপর লেখা : কম্পিউটার। উঁকি মারলে হয়তো চোখে পড়বে টেবিলের ওপর দুটো টিভি, তার সঙ্গে টাইপরাইটারের মতো কীসব লাগানো। অজানা ভয়ে এর বেশি আর এগনো যায় না। তাই অনুসন্ধানের সেখানেই ইতি। এর ফলে কম্পিউটার সম্বন্ধে ধারণাটা হয়ে যায় অন্ধের হাতি দেখার মতো। কারও ধারণা, কম্পিউটার টিভির মতো দেখতে, কারও বা ধারণা, কম্পিউটার দেখতে টাইপরাইটারের মতো। কিন্তু সত্যিই কি তাই ? ব্যাপারটা বরং একটু খতিয়েই দেখা যাক।

কম্পিউটার ব্যবহারের প্রধান সুবিধা হচ্ছে এর দ্রুত কর্মক্ষমতা। বিশেষত যেসব কাজে একই ধরনের হিসেব বারবার ব্যবহৃত হয়, সেক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার লাভজনক।

প্রথমেই জানতে হবে কম্পিউটারের কাজ কী। সাধারণভাবে মনে করা হয়, কম্পিউটার খুব সহজেই শক্ত শক্ত সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। এই ধারণা আংশিকভাবে সত্য হলেও পুরোপুরি ঠিক নয়। কারণ, কম্পিউটার সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হলে বুঝতে পারবে যে, প্রথমে অন্তত সেই সমস্যাগুলির সমাধানের উপায় কোনও মানুষকেই বার করতে হয়েছে, এবং সেই সূত্র কম্পিউটারকে বলে দিতে হয়েছে (কম্পিউটারের নিজস্ব কোনও বুদ্ধি নেই)। তবেই কম্পিউটার তোমাদের কাছে সেই সমস্যার সমাধান উপস্থিত করছে এবং তোমাদের সাহায্য করছে।

আক্ষরিক অর্থে দেখতে গেলে কম্পিউটার-এর মানে যা 'কম্পিউট'

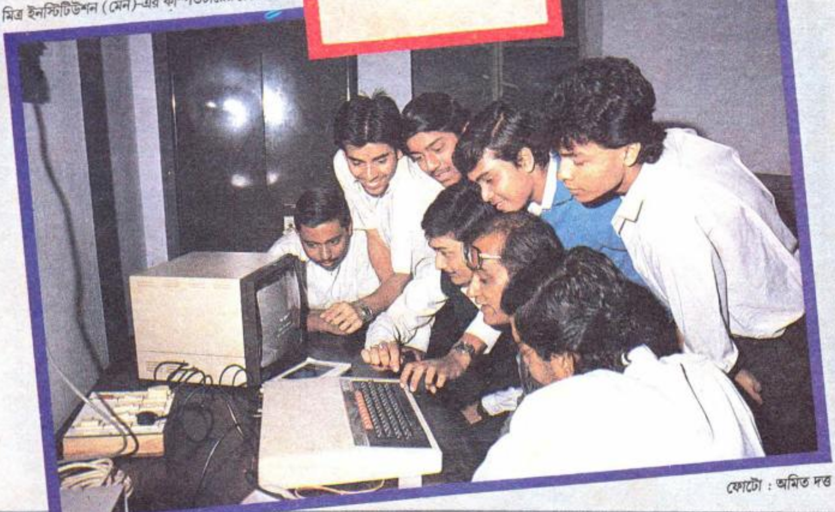

মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেন)-এর কম্পিউটারের ক্লাসে

ফোটো : অমিত দত্ত

(Compute) করে, অর্থাৎ হিসাব কষে। প্রশ্ন হতে পারে, এতে আর নতুনত্ব কী? যে কোনও পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রই তো যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এমনকী বর্গ বা বর্গমূলও কষে ফেলতে পারে! ঠিক কথা, কিন্তু একজনের পক্ষে ৩×৪ কষতে যত সময় লাগবে, ৩·৪৭৮৫×৪·১৩১২৭ কষতে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগবে। কম্পিউটার কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে সঠিক গুণফল কষে দেবে। সুতরাং কম্পিউটার ব্যবহারের প্রধান সুবিধা হচ্ছে এর দ্রুত কর্মক্ষমতা। এজন্য বিশেষত যেসব কাজে একই ধরনের হিসেব বারবার ব্যবহৃত হয়, সেক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার লাভজনক।

একটি সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। তোমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অঙ্কের সঙ্গে পরিচিত, জানো যে ক্ষেত্রফল=দৈর্ঘ্য × প্রস্থ। ধরো, কম্পিউটারকে এই ফর্মুলাটা বলে দেওয়া হল (বলেছি না, কম্পিউটার ভারী বোকা)। বইয়ে ক্ষেত্রফল অধ্যায়ের অঙ্কগুলিতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের যা-যা মান দেওয়া আছে, কম্পিউটারকে সেগুলি বলে দিলে কম্পিউটার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সঠিক ক্ষেত্রফলের মান জানিয়ে দেবে। অবশ্য কম্পিউটার ব্যবহারের পরিধি আরও বিস্তৃত।

এবার আমরা কম্পিউটারের বিশেষ ক্ষমতাগুলিকে তালিকাবদ্ধ করে ফেলি।

(১) বিশেষ সূত্রানুযায়ী কোনও হিসেব কষা, যার বারবার প্রয়োজন হতে পারে (যেমন কোনও প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের বেতনের হিসেব)।

(২) বিপুলসংখ্যক পরিসংখ্যানের মধ্য থেকে বিশেষ কোনও তথ্য খুঁজে বের করা বা সংশোধন করা।

(৩) ১ ও ২-এর সংশ্লেষে নতুন কোনও পরিসংখ্যান-তালিকা প্রস্তুত করা।

(৪) নানা বর্ণের ও ধরনের ছবি তৈরি করা, যাকে পরিভাষায় বলা হয়, 'Graphics'।

এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিন্তু কম্পিউটারকে বলে দিতে হবে তুমি কী ধরনের কাজ চাও, কী সূত্র ব্যবহার করতে হবে, পরিসংখ্যানের সব তথ্য ইত্যাদি। যদি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করো তো দেখতে পাবে যে, এই কাজগুলোর কোনওটাই মানুষের অসাধ্য নয়—শুধু সময়সাপেক্ষ মাত্র। তোমাদের হাতে যদি অঢেল সময় থাকে তা হলে কোনও কাজের জন্যই কম্পিউটারের প্রয়োজন নেই। সুতরাং সবদিক বিচার করে দেখতে গেলে কম্পিউটার ব্যবহারের সুবিধা একটাই, তা হল এর দ্রুত কাজ করার ক্ষমতা।

কম্পিউটারের অন্তরাত্মা, যাকে 'Central Processing Unit' বা সংক্ষেপে 'CPU' বলা হয়, তা হল প্রধানত 'মাইক্রোপ্রসেসর' নামে একটি খুদে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ। এই মাইক্রোপ্রসেসর মানুষের ভাষা বোঝে না, বোঝে কিছু বৈদ্যুতিক সঙ্কেত—নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় ভোল্টেজের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি (একে দ্বিনিধানি বা binary পদ্ধতি বলা হয়)। মাইক্রোপ্রসেসর এই সঙ্কেত পেয়ে সাড়া দেয় একই পদ্ধতিতে। মাইক্রোপ্রসেসরকে কোনও উপযুক্ত বৈদ্যুতিক সঙ্কেত দিয়ে তার কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট বৈদ্যুতিক সঙ্কেতের সাড়া পাওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় ওই মাইক্রোপ্রসেসরকে 'প্রোগ্রাম' করা। আমরা কম্পিউটারকে যা কিছু করতে দেখছি, তা কিন্তু মূলগতভাবে এই পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে।

এই প্রোগ্রাম করা সাধারণ লোকের পক্ষে বেশ জটিল কাজ। তাই কম্পিউটার এঞ্জিনিয়াররা কাজটাকে সহজতর করার জন্য কম্পিউটারের মাইক্রোপ্রসেসরটিকে এমনভাবে প্রোগ্রাম করে দেন এবং এমন যন্ত্রাংশ তার সঙ্গে লাগিয়ে রাখেন যে, একজন সাধারণ লোক সহজবোধ্যভাবে কম্পিউটারের সঙ্গে 'কথাবার্তা' চালাতে পারে—অর্থাৎ, কম্পিউটারকে কোনও আদেশ দিতে পারে এবং তার সাড়া বুঝতে পারে। এই প্রোগ্রামকে বলা হয় 'Operating System' বা সংক্ষেপে 'OS'। OS সাধারণত কোনও বিখ্যাত সংস্থার বিশেষ কোনও ধরনের কম্পিউটারের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। যে সমস্ত কম্পিউটার ওই বিশেষ কম্পিউটারের OS ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে তাদের ওই কম্পিউটারের compatible system বলা হয়। এখন প্রচলিত ছোট কম্পিউটারগুলির অধিকাংশ IBM PC/XT/AT Compatible System। তোমাদের স্কুলের কম্পিউটার সাধারণত BBC Micro Compatible। তাই আমাদের আলোচনাও আপাতত BBC Micro Compatible System-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব।

তা হলে কি শুধুমাত্র CPU, অর্থাৎ, মাইক্রোপ্রসেসর এবং কিছু আনুষঙ্গিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ এবং OS নিয়েই কম্পিউটার হয়ে গেল? না—এগুলো দিয়ে কম্পিউটারের একটি অংশমাত্র হল। এর পর

কিবোর্ড, সিপিইউ, ডিস্ক ড্রাইভ ও ভিডিও মনিটর (জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন-এর সৌজন্যে)

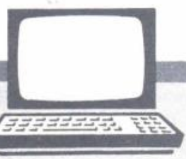

প্রোগ্রাম করা সাধারণ লোকের পক্ষে বেশ জটিল কাজ। তাই কম্পিউটার এঞ্জিনিয়াররা কাজটাকে সহজতর করার জন্য কম্পিউটারের মাইক্রোপ্রসেসরটিকে এমনভাবে প্রোগ্রাম করে দেন এবং এমন যন্ত্রাংশ তার সঙ্গে লাগিয়ে রাখেন যে, একজন সাধারণ লোক সহজবোধ্যভাবে কম্পিউটারের সঙ্গে 'কথাবার্তা' চালাতে পারে—অর্থাৎ, কম্পিউটারকে কোনও আদেশ দিতে পারে এবং তার সাড়া বুঝতে পারে।

প্রয়োজন এমন কিছু-কিছু যন্ত্রাংশের, যার সাহায্যে যে-কোনও লোক ইলেকট্রনিক্সের জ্ঞান ছাড়াও OS-এর মাধ্যমে কম্পিউটারকে কোনও আদেশ দিতে পারে, এবং কম্পিউটারের উত্তর তার কাছে সহজবোধ্য হয়। এই যন্ত্রগুলিকে মোটামুটিভাবে দু' ভাগে ভাগ করা যায়। এক, যার সাহায্যে কোনও আদেশ কম্পিউটারের মধ্যে পৌঁছয়। এদের বলা হয় Input Peripherals এদের মধ্যে Punched Card Reader, Paper Tape Reader এবং Keyboard সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। তোমাদের স্কুলের কম্পিউটারে Keyboard ব্যবহার করা হয়েছে। তাই আমরা আমাদের আলোচনা Keyboard এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। আর দুই, যার সাহায্যে কম্পিউটারের সাড়া সহজবোধ্যভাবে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছয়, এদের বলা হয় Output Peripherals। এদের মধ্যে Video Monitor, Printer, Plotter ইত্যাদি সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এবার আমরা কম্পিউটারকে সব অংশ মিলিয়ে এক করে দেখতে চেষ্টা করি। তোমাদের স্কুলের কম্পিউটারে যা-যা আছে, তা হল:

(১) CPU ও Keyboard মিলিয়ে একটি অংশ। এটি টাইপরাইটারের মতো দেখতে, তবে আকারে অপেক্ষাকৃত চ্যাপটা। টাইপরাইটারে কাগজ পরানোর মতো কোনও জায়গা এতে নেই। প্রকৃত অর্থে এই অংশটিই কম্পিউটার।

(২) Video Monitor— এটি সাধারণ রঙিন টিভির মতো দেখতে (এটি একটি TV set)। ১—এর সঙ্গে এটি flat cable দ্বারা সংযুক্ত থাকে।

(৩) Printer— এটি টাইপরাইটারের যেখানে কাগজ পরানো হয়, অনেকটা তার মতো দেখতে। এটিও ১ -এর সঙ্গে flat cable দ্বারা সংযুক্ত থাকে।

এবার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে কম্পিউটারের CPU এবং keyboard, ২ – Video Monitor ও ৩— Printer (যদি লাগানো থাকে)—এদের একে একে switch on করা। সাধারণত Voltage Stabilizer এর মাধ্যমে এদের power দেওয়া থাকে। যদি না থাকে, তা হলে Voltage Stabilizer এর ব্যবস্থা করে নেওয়া প্রয়োজন। power on করার সময় প্রথমে Video Monitor তারপর Printer এবং সবশেষে CPU কে on করতে হবে,। off করার সময় ঠিক এর উলটো CPU থেকে off করা শুরু করতে হবে।

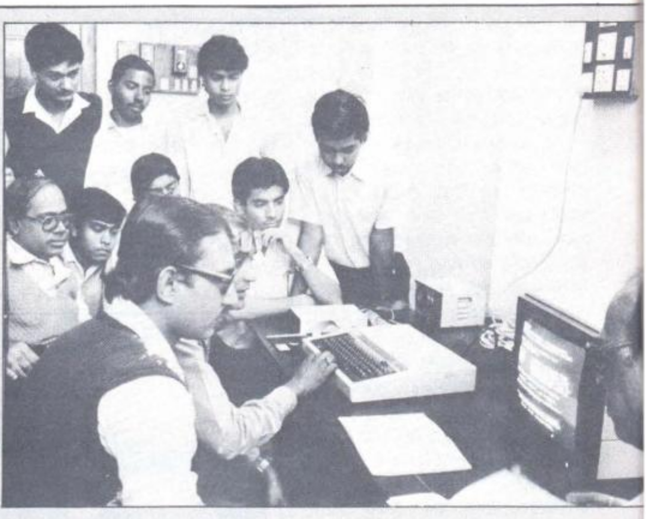

কম্পিউটারকে বলে দিতে হবে তুমি কী ধরনের কাজ চাও, কী সূত্র ব্যবহার করতে হবে। পরিসংখ্যানের সব তথ্যই তাকে জানাতে হবে। যদি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করো তো দেখতে পাবে যে, এই কাজগুলোর কোনওটাই মানুষের অসাধ্য নয়—শুধু সময়সাপেক্ষ মাত্র।

সব switch on করা হয়ে গেলে Monitor এর screen-এর দিকে তাকাও। এর পর যতক্ষণ কম্পিউটার নিয়ে কাজ করবে, প্রায় সব সময় এই screen-এর দিকে নজর রাখতে হবে। কারণ তোমরা কম্পিউটারকে যা-যা নির্দেশ দেবে, এবং কম্পিউটার সেইসব নির্দেশের যা-যা উত্তর দেবে, সবই এই screen-এ ইংরেজি ভাষায় লিখিতভাবে দেখা যাবে। শুধু তাই নয়, অনেক সময় এই screen-এ কম্পিউটারেরও নির্দেশ দেখা যাবে—এর পর কী করতে হবে তাই নিয়ে। যদি তোমাদের কোনও ভুল হয়ে থাকে, কম্পিউটার এই screen-এ সে-কথাও লিখে জানিয়ে দেবে। এইভাবে কম্পিউটারের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান লক্ষ বা 'monitor' করা হয়। তাই সঠিকভাবে একে Output Peripherals না বলে Monitor বলা হয়ে থাকে।

switch on করার কিছুক্ষণ বাদে দেখতে পাবে screen-এ এই লেখাগুলি ফুটে উঠেছে:

BBC computer 32 k
ACORN DFS
OK

একে বলা হয় কম্পিউটারের 'sign on message'-এর থেকে বোঝা যাবে কম্পিউটার ঠিক আছে। এর নীচে দেখা যাবে

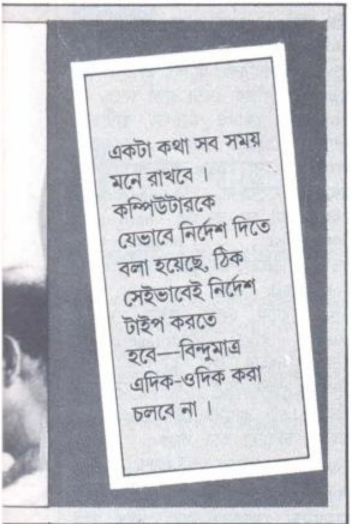

একটি ">" চিহ্ন, তার ঠিক পাশেই একটি ছোট্ট জায়গায় একটা আলো দপদপ করে জ্বলছে ও নিভছে। > চিহ্নটিকে বলা হয় 'system prompt' এবং দপদপ করা আলোকচিহ্নটিকে বলা হয় 'Cursor'। prompt আসার অর্থ কম্পিউটার তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে প্রস্তুত। এটা screen-এ যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ কম্পিউটারকে কোনও নির্দেশ দেওয়া চলবে না।

কম্পিউটার প্রস্তুত হলে এবার তাকে নির্দেশ দিতে শুরু করতে হবে। এই নির্দেশ দিতে হবে keyboard-এর মাধ্যমে। সুতরাং এবার keyboard-এর দিকে তাকাও। এটা মোটামুটি টাইপরাইটারের keyboard এরই মতো—কয়েক সারি key বা চাবি নিয়ে গঠিত। তবে এর মধ্যে অতিরিক্ত কিছু চাবিও আছে, সেগুলি হল F1 থেকে F10, এই দশটি চাবি, Caps lock, CTRL (control), Break, shift, Escape, Return, Copy এবং Cursor সরানোর জন্য ←, →, ↑ এবং ↓ চিহ্নিত চাবিগুলি। switch on করা হলে দেখবে caps lock চাবিটির উপর একটা লাল আলো জ্বলে উঠেছে। এই আলো যতক্ষণ জ্বলে থাকবে, ততক্ষণ A থেকে Z পর্যন্ত যে-কোনও হরফই টাইপ করো না কেন তা বড় হাতের হরফে, অর্থাৎ capital letter-এ screen এ লিখিত হবে। caps lock চাবিটি একবার টিপলে এর ওপরের আলো নিভে যাবে, আবার caps lock টিপলে আলোটি জ্বলে উঠবে। caps lock এর আলো নিভে থাকলে তখন যা টাইপ করা হবে তা ছোট হাতের হরফে screen-এ লিখিত হবে। ছোট হাতের হরফে টাইপ করতে করতে যদি কোনও অক্ষর বড় হাতের হরফে টাইপ করার প্রয়োজন হয়, তখন shift চাবিটি টিপে ধরে থেকে ওই হরফটির চাবি টিপলেও তা বড় হাতের হরফে টাইপ হবে। এ ছাড়াও shift চাবিটির আর-একটি কাজ আছে। তা হল—অনেক চাবিতে দেখবে দুটি করে চিহ্ন আছে, একটি নীচে, অন্যটি উপরে। সাধারণ অবস্থায় ওই চাবি টিপলে নীচের চিহ্নটি টাইপ হবে। কিন্তু shift টিপে ধরে থেকে ওই চাবি টিপলে উপরের চিহ্নটি টাইপ হবে। এক্ষেত্রে টাইপ হবে বলতে বোঝানো হয়েছে screen-এ লিখিত হবে, cursor যেখানে আছে সেখানে। screen-এ লেখার অবস্থানকে ইচ্ছেমতো সরাতে হলে প্রথমে → (ডান দিকে), ← (বাঁ দিকে), ↑ (উপর দিকে) বা ↓ (নীচের দিকে) চিহ্নিত চাবি টিপে cursor কে সেখানে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তারপর টাইপ করতে হবে। একটি চিহ্ন বা হরফ screen-এ টাইপ হলে cursor আপনা থেকেই একঘর ডান দিকে সরে যাবে, পরের চিহ্ন বা হরফকে সেখানে বসানোর জন্য যদি এই জায়গা ফাঁকা রাখতে হয় (দুটি শব্দের মধ্যে ফাঁকের মতো) তা হলে keyboard-এর একদম নীচের লম্বা কোনও চিহ্ন না দেওয়া চাবিটি, যাকে space bar বলে, একবার টিপলে cursor একটি ফাঁকা জায়গা রেখে একঘর ডান দিকে সরে যাবে।

এক্ষেত্রে কিন্তু একটা কথা সব সময় মনে রাখবে। কম্পিউটারকে যেভাবে নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে, ঠিক সেইভাবেই নির্দেশ টাইপ করতে হবে— বিন্দুমাত্র এদিক-ওদিক করা চলবে না। অর্থাৎ, যদি 'Yes' টাইপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়, তা হলে ঠিক ওইভাবেই অর্থাৎ, বড় হাতের 'Y' এবং ছোট হাতের 'e' এবং 's' টাইপ করতে হবে। যদি নির্দেশে দুটি শব্দের মধ্যে দুটি ফাঁকা জায়গা রাখতে বলা হয়, তা হলে টাইপ করার সময় ওই দুটি শব্দের মধ্যে দুটি ফাঁকা জায়গাই রাখতে হবে। এই কারণে আমরা একটি ফাঁকা জায়গাকেও একটি ফাঁকা অক্ষর বলে ধরব, যা এখানে দেখাব b দিয়ে এবং টাইপ করব Space bar একবার টিপে। টাইপ করতে-করতে screen -এ এক লাইন যখন পুরো ভর্তি হয়ে যাবে, cursor তখন আপনা থেকেই পরের লাইনের শুরুর অবস্থানে চলে আসবে। কিন্তু নির্দেশ পুরো টাইপ করা হয়ে গেলেও যতক্ষণ Return চাবিটি না টেপা হচ্ছে, কম্পিউটার সেই নির্দেশ গ্রহণ করবে না। সুতরাং প্রতিটি নির্দেশ যথাযথভাবে টাইপ করা হলে, তারপর Return চাবিটি একবার টিপতে হবে। এখানে টাইপ করার নির্দেশের ক্ষেত্রে যে-যে চিহ্নগুলির চাবি ব্যবহার করতে হবে সেই চিহ্নগুলি দেখাব, এবং যদি কোনও শব্দ লেখা চাবি ব্যবহার করতে হয় তো সেই শব্দটির দু'দিকে [ ] চিহ্ন ব্যবহার করব। অর্থাৎ, যদি RETURN নির্দেশ দেওয়া থাকে তা হলে যথাক্রমে 'R','E','T','U','R','N' চিহ্নিত চাবিগুলি টিপতে হবে। কিন্তু যদি

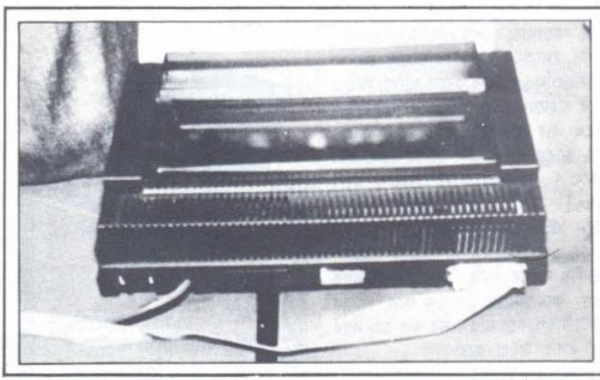

প্রিন্টার (জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন-এর সৌজন্যে) *ফোটো: গৌতম সান্যাল*

[RETURN] নির্দেশ দেওয়া থাকে তা হলে Return ' লেখা চাবিটি টিপতে হবে।

এইবার screen-এ > চিহ্নটির পাশে যেখানে cursor আছে সেখান থেকে এইভাবে টাইপ করতে আরম্ভ করো : (> চিহ্নটি দেখানো হল—এটা টাইপ করবে না।)

```
> 5Ø ƀ CLS [RETURN]
> 1Ø ƀ PRINT ƀ 'THIS IS A SAMPLE PROGRAM' [RETURN]
> 2Ø ƀ PRINT ƀ 'IT ASKS YOUR NAME AND GREETS YOU' [RETURN]
> 3Ø ƀ PRINT [RETURN]
> 4Ø ƀ PRINT ƀ 'WHAT IS YOUR NAME?' [RETURN]
> 5Ø ƀ INPUT ƀ A$ [RETURN]
> 6Ø ƀ PRINT [RETURN]
> 7Ø ƀ PRINT ƀ 'PLEASED TO MEET YOU"; A$ [RETURN]
> 8Ø ƀ END [RETURN]
```

"Ø" চিহ্নটা দেখে ঘাবড়ে যেও না, ইনি হচ্ছেন তোমাদের বহু পরিচিত 'শূন্য' বা 'Zero'। যাতে ইংরেজি অক্ষর 'O'-এর সঙ্গে গোলমাল না হয়ে যায় তাই এভাবে আলাদা করা হয়েছে।

ধরো, টাইপ করতে গিয়ে কোথাও ভুল হয়ে গেল, তখন কী করবে? এখন cursor আছে একেবারে শেষ লাইনের তলায়। সেখান থেকে ↑ (দরকারমতো অন্যান্য তীরচিহ্নগুলিও ব্যবহার করতে পারো) চিহ্নিত চাবির সাহায্যে cursor-কে যে লাইনে ভুল হয়েছে তার একদম শুরুতে (অর্থাৎ 4Ø দিয়ে আরম্ভ যে লাইন, তাতে ভুল হয়ে থাকলে 4 এর তলায়) নিয়ে যাও। এবার [copy] চাবিটি টিপলে একদম নীচের লাইনে ওই লাইনটিই আবার টাইপ হতে থাকবে, অর্থাৎ ওখানে copy হবে। লাইনটির যতদূর পর্যন্ত ঠিক আছে, ততদূর copy করে নিয়ে ভুল শুদ্ধ করে আবার বাকিটা টাইপ করে নাও। সব ভুল শুদ্ধ করে নিয়ে এবার টাইপ করো :

> RUN [RETURN]

দেখবে screen-এর সব লেখা মুছে গিয়ে ফুটে উঠবে :

```
THIS IS A SAMPLE PROGRAM
IT ASKS YOUR NAME AND GREETS YOU
WHAT IS YOUR NAME ?
?
```

শেষ লাইনের ? চিহ্নটির পাশে আবার cursor দেখা যাবে।

MICKEY MOUSE [RETURN]

এই জায়গায় তোমার নিজের নাম টাইপ করতে হবে। Return চাবিটি টেপার পর দেখতে পাবে screen-এ এক লাইন বাদ দিয়ে ফুটে উঠেছে :

```
PLASED TO MEET YOU.
MICKEY MOUSE
OK
>
```

এর পর যদি আবার RUN টাইপ করে Return টেপো, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে— কম্পিউটার আবার এই কাজ করবে। যা টাইপ করে কম্পিউটারকে কি করতে হবে বললে (লাইন 5 থেকে 8Ø পর্যন্ত) তাকে বলা হয় program। এই program কিন্তু মাইক্রোপ্রসেসর-এর program থেকে আলাদা ধাঁচের। এটি অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ এর সঙ্গে ইংরেজি ভাষার অনেকটাই মিল রয়েছে। এই program BASIC ভাষায় (কম্পিউটারের একটি ভাষা, মানুষের নয়) লেখা হয়েছে। তোমাদের স্কুলের কম্পিউটারে এই BASIC ভাষাতে program লেখা যাবে।

কিন্তু একটা ঝামেলা রয়ে গেল যে! যে মুহূর্তে কম্পিউটারকে switch off করে দেবে, এই Program কম্পিউটার থেকে মুছে যাবে। পরের বার আবার এই program টাইপ করে নিয়ে তবেই চালাতে হবে। খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার, তাই না? এর হাত থেকে বাঁচার একটা রাস্তা আছে, এই program কোনও জায়গায় স্থায়ীভাবে 'লিখে' রেখে দেওয়া। সাধারণত program বা data স্থায়ীভাবে লিখে রাখার জন্য যা-যা storage device ব্যবহার করা হয়, তা হল hard disk, floppy disk, magnetic tape প্রভৃতি। তোমাদের স্কুলের কম্পিউটারে floppy disk এবং magnetic audio tape (যাকে চলতি কথায় audio cassette বলো) storage device হিসাবে ব্যবহার করা হয়। audio cassette-এর সঙ্গে তোমরা মোটামুটি পরিচিত। এটি ক্যাসেট টেপ রেকর্ডার-এর সাহায্যে চালানো হয়ে থাকে। floppy disk সম্বন্ধে সামান্য একটু ধারণা দিচ্ছি।

বইয়ে ক্ষেত্রফল অধ্যায়ের অঙ্কগুলিতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের যা যা মান দেওয়া আছে, কম্পিউটারকে সেগুলি বলে দিলে কম্পিউটার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সঠিক ক্ষেত্রফলের মান জানিয়ে দেবে। অবশ্য কম্পিউটার ব্যবহারের পরিধি আরও বিস্তৃত।

floppy disk দেখতে একটি ছোট গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো, কিন্তু খুবই পাতলা ও নমনীয় (যার জন্য এর নাম হয়েছে floppy বা লতপতে), এর ব্যাস $5\frac{1}{4}$ ইঞ্চি— অন্য কম্পিউটারের ক্ষেত্রে অন্য মাপেরও হয়। সাধারণ অবস্থায় এই disk একটা চৌকো খামে বন্ধ থাকে, এবং এই খামে বন্ধ অবস্থাতেই একে ব্যবহার করতে হয়। এই খামসুদ্ধ disk টি আর-একটি ছোট কাগজের খামে রাখা থাকে। এই কাগজের খামটি অবশ্য ব্যবহারের সময় খুলে রাখতে হবে। কম্পিউটারের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের program এই disk-এ স্থায়ীভাবে লিখে রেখে দিতে পারো। কম্পিউটার প্রয়োজন মতো। সেই program পড়ে নিয়ে কাজ করতে পারবে। কিন্তু মনে রাখবে—নতুন কোনও disk-এ program লেখা যাবে না। একেবারে প্রথমবার কোনও disk ব্যবহারের আগে একটি বিশেষ program ওই disk-এ লিখে রাখতে হয়। তবেই কম্পিউটার ওই disk-এ কিছু লিখতে (write করতে) বা ওই disk থেকে কিছু পড়তে (read করতে) পারবে। একে বলা হয় disk টিকে format করা। এরপর এই disk ব্যবহার ও format করার বিষয়টি নিয়ে আগামী সংখ্যায় আলোচনা করব। আশা করি, পুরো লেখাটি পড়ার পর স্কুলের কম্পিউটার রপ্ত করার কাজটি তোমাদের পক্ষে সহজ হবে। (ক্রমশ)

রাজার বাড়ি

দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

ছোট্ট খুকুর রাজার বাড়ি ছাদের একটি কোণে,
হলদে রঙের পাপড়ি দিয়ে গল্প বানায় মনে ।
মনে মনে বানায় এবং কানে কানে শোনে,
হিরের ছুরি বাতাস কেটে সোনালি দিন গোনে ।
লাল গোলাপি ধুলোর ঝড়ে আকাশ রঙিন হল,
স্বর্গ থেকে ঢেউ তুলে এক রাজার বাড়ি এল ।

রাজার বাড়ির দরজা কপাট জানলাটিও সোনার,
উথালপাথাল বাতাস দিল মিঠে এবং লোনা ।
সেই হাওয়াতে খুকুর চোখে ঝিনুককুচি পড়ে,
স্বপ্নগুলি নিজের স্থানে আবার নড়েচড়ে ।
বৈদূর্য, বিদ্রুম, বজ্র, পান্না, পলার মেঝে,
রাজা রানি রত্নপুতুল হরেকরকম সেজে,

রাজকন্যা মৃগশিরা এলিয়ে থাকেন চুল,
কানে দুটি অত্যুজ্জ্বল পূর্বষাঢ়ার দুল ।
আকাশ থেকে নেমে আসে সাতটি ঋষির রথ,
স্বপ্ন-পাতাল রক্ষা করেন সাতাশটি নীল মথ ।
যখন তখন ছোট্ট খুকু ফুলের গয়না পরে
লম্বা একটি ছুট লাগিয়ে পৌঁছে রাজার ঘরে ।

জুঁই, চামেলি, বকুল, বেলি সখীর মতন ফোটে,
পথভ্রমর ভুলের চোটে এদের কাছেই জোটে ।
দুধের সরের ফেনিল সাদা ম্যাজিক-ফ্রকটি গায়,
মেঘের ঘোড়ায় মোমের পুতুল রাজার বাড়ি যায় ।
কাশের মতো সাদা এবং হালকা ওদের মন,
গল্পগুলি ঝিনুক দিয়ে ভাঙছে অনুক্ষণ ।

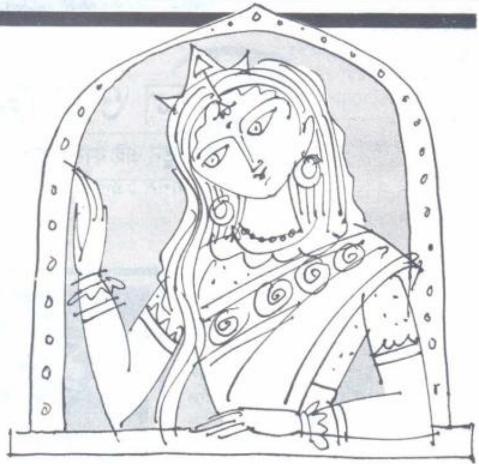

তেপায়া টেবিল

সুদেষ্ণা সরকার

তেপায়া টেবিল তিনদিকে তার তিনজন চুপচাপ
থমথমে ঘর, বাইরে বৃষ্টি ঝমঝম, ঝুপঝাপ ।
টিমটিমে আলো, যত কালো কালো ছায়া দেয়ালের গায়,
রাত নিঝঝুম চোখে নেই ঘুম, অশরীরী, তোরা আয় ।

"দলাদলি নিয়ে ঘোলাঘুলি হল কত জায়গার জল
আসছে বছর লিগ ফাইনাল কোন্ দল জেতে বল !
বাঘা বোস নাকি ক্লাব ছেড়ে যাবে, রোঘো দাশ যাবে চিনে
বিস্তর মার-হাঙ্গামা হবে পয়লা খেলার দিনে ?
পুলিশের চোখ এড়িয়ে সেদিন পাব কি হাতের সুখ ?"
নিঃসাড় ঘরে তেপায়া টেবিল দুলে ওঠে ঠুকঠুক ।

"ঘোড়দৌড়ের বরাত আমার মন্দ যে, নেই সন্দ,
যে ঘোড়াটা বাছি, তারই চার খুরে কাটে দৌড়ের ছন্দ ।
লটারিতে রোজ এন্তার টাকা ব্যয় করে লবডংকা,
চৌকাঠখানা পেরোলেই আছে পাওনাদারের শঙ্কা ।
কোন পথে গেলে হালে পানি মেলে, চৌদিক খুলে যায় ?"
নিঃসাড় ঘরে তেপায়া টেবিল ঠকঠক দুলে যায় ।

"উপন্যাসের প্লট নিয়ে লাগে নিত্য দক্ষযজ্ঞ,
সম্পাদকের মনেই ধরে না, এত নির্দয় লোক গো !
কবিতায় মিল জোটানো কঠিন, পদ্যে মেলে না ভাষা রে,
শখ করে দুটো গপ্পো লিখতে নিন্দুকে বলে, আষাঢ়ে !
এ ছড়াখানা কি সম্পাদকের পছন্দ হবে মোটে ?"
নিঃসাড় ঘরে তেপায়া টেবিল ঠকঠক দুলে ওঠে ।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

খেলাধুলো

অতুল ওয়াসনের বড় অস্ত্র আউটসুইং

নতুন এই ফাস্ট বোলারের নানা অজানা তথ্য জানিয়েছেন
মানস চক্রবর্তী

পাকিস্তান সফরের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা হওয়ার পরেই নির্বাচন সমিতির চেয়ারম্যান রাজ সিংহ বলেছিলেন, "আমরা আরও একজন ফাস্ট বোলারের কথা ভেবেছিলাম। ইরানি ট্রোফিতে ও দারুণ বল করেছে। ওকে পাকিস্তান নিয়ে যেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু শ্রীকান্ত একজন অতিরিক্ত ব্যাটসম্যান চাইল। তাই রমন লাম্বাকে নিতে হল। বাদ গেল অতুল ওয়াসন।" কিন্তু বেশিদিনের জন্য দিল্লির এই যুবকটিকে বাদ দিয়ে ভারতীয় দল গড়া গেল না। গেল না, কারণ এই মুহূর্তে যাঁরা টেস্ট খেলেননি কিংবা পাকিস্তান যেতে পারেননি তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল বল করছেন রাজধানীর মায়াপুরী ইনডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার ওই যুবকটি। ইরানি ট্রোফিতে চমৎকার বোলিং করার পর ভারতীয় দলে ঢোকার জন্য অতুলের সামনে একটি রাস্তাই খোলা ছিল। তা হল রঞ্জির আঞ্চলিক ম্যাচগুলিতে দারুণ বল করা। এবং কী বল অতুল করেছেন তার প্রমাণ ওঁর উইকেটগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ১০টি (৫+৫), জম্মু ও কাশ্মিরের বিরুদ্ধেও ১০টি (৭+৩), হরিয়ানার বিপক্ষে ৯টি (৫+৪), পঞ্জাবের বিপক্ষেও ৯টি (৬+৩) এবং বৃষ্টিতে ধুয়ে যাওয়া (মাত্র আধঘণ্টা খেলা হয়েছিল) হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচটিতেও একটি। মোট ৪০টি উইকেট তিন দিনের মাত্র পাঁচটি ম্যাচে। ইদানীংকালে ভারতের মাটিতে রঞ্জি ক্রিকেটে এ-ধরনের ফাস্ট বোলিংয়ের নমুনা বেশি নেই। এর পরেও যদি নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য অতুল মনোনীত

> মোট ৪০টি উইকেট তিন দিনের মাত্র পাঁচটি ম্যাচে। ইদানীংকালে ভারতের মাটিতে রঞ্জি ক্রিকেটে এ-ধরনের ফাস্ট বোলিংয়ের নমুনা বেশি নেই।

বেঙ্কটপতির কথা আগে থেকেই বলছিলেন বাসু পরঞ্জপে

নতুন স্পিনার বেঙ্কটপতি রাজুর কথা লিখেছেন **আশিস উপাধ্যায়**

তরুণ বাঁ হাতি স্পিনার বেঙ্কটপতি রাজুর কথা অনেকদিন ধরেই বলে আসছিলেন বাসু পরঞ্জপে। বাসু পরঞ্জপে ছিলেন জাতীয় কোচ। কিন্তু তাঁর কথায় কান না দিয়ে বিগত পাকিস্তান সফরে দলে নেওয়া হয় ন্যাটা স্পিনার মনিন্দর সিংকে। পাকিস্তান সফরে দলে আর একজন ন্যাটা স্পিনার ছিলেন। রবি শাস্ত্রী। এবার নিউজিল্যান্ড সফরে এবং হয়তো তার পরেও বেঙ্কটপতি রাজুকে দলের স্পিন বোলিংয়ের দায়িত্ব অনেকটাই বহন করতে হবে। হায়দরাবাদের স্পিনার বেঙ্কটপতির কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী এবার দলে নেই। অজয় শর্মা বাঁ হাতে স্পিন বল করলেও নিয়মিত স্পিনার হিসেবে তিনি কখনও দলে আসেননি। ব্যাটসম্যান হিসেবেই তিনি বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকেন।

এবার দলিপ ট্রোফির ম্যাচগুলিতে চমৎকার বল করেছেন বেঙ্কটপতি। দলিপ ট্রোফির ফাইনালে ১২৯ রানে তিনি মধ্যাঞ্চলের ছ'টি উইকেট দখল করেন। তাঁর বোলিংয়ের গড় ৪২-৯-১২৯-৬। ও বেঙ্কটরামনা দখল করেন তিনটি উইকেট। তাঁর বোলিংয়ের গড় ১৯-২-১-৭৮-৩। মধ্যাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য বেঙ্কটরামনা নেন ছ'টি উইকেট। ১৮ ওভারে ৬২ রান দিয়ে বেঙ্কটপতি পেয়েছেন একটি উইকেট।

বেঙ্কটপতি রাজু

দলিপ ট্রোফির সেমিফাইনালে পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে বেঙ্কটপতি নিয়েছেন ১১৩ রানে তিনটি উইকেট।

বেঙ্কটরামনা ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে নিজের দক্ষতা দেখানোর তেমন সুযোগ পাননি। এবার নিউজিল্যান্ড সফরে তাঁকেও দলে নেওয়া হয়েছে। অফ স্পিনার বেঙ্কটরামনার সামনে এবার যে সুযোগ এল তাঁকে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। তিনি বল 'ফ্লাইট' করাতে ভয় পান না। পুরনো দিনের অফ স্পিনারের সব কৌশলই তাঁর আয়ত্তে। এখন কে বেশি সফল হন, বেঙ্কটপতি না বেঙ্কটরামানা সেটাই দেখার।

না হতেন, তা হলে তাঁর প্রতি অবিচার হত।

অতুল কিন্তু সফরে স্থান পাওয়ার ব্যাপারে শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত ছিলেন। ডিসেম্বরের শেষে দিল্লির এক হোটেলে বসে অতুলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। টেলিফোনে সাক্ষাৎকার নেওয়ার কথা বলতেই বিনয়ী এই যুবকটি বলেছিলেন, "আপনাকে আসতে হবে না। আমিই আপনার হোটেলে চলে যাব।" এবং এসেওছিলেন এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে। আদর্শ ফাস্ট বোলারের মতো শরীর। ছ' ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা। হাতের পাঞ্জা দুটো শরীরের তুলনায় একটু বড়ই। অত বড় চেহারা, কিন্তু বেতের মতো নমনীয়। মুখের আদল অনেকটা ভারতের প্রাক্তন গোলকিপার ব্রহ্মানন্দের মতো। প্রাথমিক পরিচয়ের পালা শেষ হতেই আমরা ঢুকে পড়েছিলাম ভারতীয় দলে ওঁর স্থান পাওয়ার সম্ভাবনার প্রশ্নে। অতুল বলছিলেন "কপিল, মনোজ তো নিউজিল্যান্ড যাবেনই। সিরিজের শেষ দিকে বিবেক রাজদান যা বল করেছেন তাতে ওঁর যাওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। বাকি স্থানটির জন্য লড়াই আমার সঙ্গে রাজীব শেঠের। তবে রঞ্জিতে আমি যা উইকেট পেয়েছি, রাজীব তার ধারে-কাছে নেই। কাজেই...।" কিন্তু চেতন শর্মা? যাঁকে পাকিস্তান পাঠানো হয়নি বলে প্রচণ্ড শোরগোল উঠেছিল? "জানি। কিন্তু চেতন রঞ্জিতে এত খারাপ বল করেছেন যে, ওঁকে তো দলিপ ট্রোফিতে ডাকাই হয়নি। মনে হয় না চেতন ফিরে আসতে পারবেন। আমি যা বল করেছি তাতে এখনই আমার সুযোগ পাওয়া উচিত। কারণ, নিউজিল্যান্ডের উইকেট এবং আবহাওয়া সুইং বোলিংয়ের পক্ষে আদর্শ। এবার সুযোগ পেলে নিজেকে প্রমাণ করা অনেক সহজ হবে। না হলে আবার বসে থাকতে হবে। অবশ্য আমাদের ট্রায়াল ম্যাচ কিন্তু দলিপ ট্রোফি। ওখানে ভাল বল করতে হবে।"

বিশাখাপত্তনমে দলিপ সেমিফাইনালে মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে অতুল খুব খারাপ বল করেননি। তবে, নিখুঁত ব্যাটিং-উইকেটে ঘায়েল করতে পারেননি মধ্যাঞ্চলের ব্যাটসম্যানদের। তাতে অবশ্য তাঁর ভারতীয় দলে ঢোকা আটকায়নি। দল ঘোষণার শেষে রাজ সিংহ বলেছেন, "ভারতীয়দের আগামী দিনের বোলিং আক্রমণ নির্ভর করবে প্রভাকর, রাজদান আর ওয়াসনের ওপর।" তাঁর ওপর নির্বাচকদের আস্থাকে নিশ্চয়ই সম্মান জানাবে অতুলের বল। কারণ তিনি লড়াই করতে ভালবাসেন। ক্রিকেট থেকে সব-কিছু তিনি অর্জন করেছেন। অথচ, ওঁর শুরুটা কিন্তু খুব একটা আহামরি ছিল না। হেলে সাপ না ধরে কেউটে ধরার মতো ব্যাপার ছিল সেটা। জীবনের প্রথম রঞ্জি ম্যাচ ছিল রঞ্জির ফাইনাল (১৯৮৬-৮৭)। পনেরোজনের দলে ছিলেন অতুল—তখন বয়স মাত্র সতেরো। ফাইনালের দিন সকালে অধিনায়ক মদনলাল নিজেকে 'আনফিট' ঘোষণা করায় একেবারে শেষ মুহূর্তে অতুলকে দলে নেওয়া হয়। হায়দরাবাদ ম্যাচটা জিতেছিল। অতুল পেয়েছিলেন মাত্র একটি উইকেট। তবে শেষ উইকেটে ভাস্কর পিল্লাই-এর সঙ্গে প্রায় দু' ঘণ্টা ব্যাট করে দলের পতন অনেকটা আটকেছিলেন।

দিল্লির হয়ে নিয়মিত খেলার সুযোগ না পেলে কী হবে, অতুল তিন বছর ইংল্যান্ডে খেলে নিজেকে আরও পরিমার্জিত করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৮৭-তে তিনি খেলেন

অতুল ওয়াসন

অতুলের 'আইডল' হলেন কপিলদেব। এবং ডেনিস লিলি। তবে ম্যাচের মধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কীভাবে বল করতে হবে, তা শিখিয়েছেন মদনলাল।

ল্যাঙ্কাশায়ার লিগে মোরস্যাম্ব ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে। এই ক্লাবে এর আগে খেলেছেন রবি শাস্ত্রী, গোপাল শর্মা, চেতন শর্মা ও ভরত অরুণ এবং এখানে খেলতে-খেলতেই অতুল ভেঙে দেন দিলীপ দোশির রেকর্ড (১০৯টি উইকেট)। তাঁর সংগ্রহ ছিল ১১০। '৮৮ এবং '৮৯ মরসুমে অতুল খেলেছেন ইয়র্কশায়ার লিগে মার্সডেন ক্রিকেট ক্লাবে। "ওখানে শনি ও রবিবার এই খেলাগুলি হয়। এবং প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা। আমি মার্টিন ক্রো, মার্ক গ্রেটব্যাচ, কেন রাদারফোর্ডদের বিরুদ্ধে বল করেছি। নিউজিল্যান্ড সফরে যদি নির্বাচিত হই, এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে।"

আমাকে যখন এই কথাগুলি বলেছিলেন অতুল, তখনও তিনি নিউজিল্যান্ড সফরে নির্বাচিত হননি। দিল্লিরই ছেলে অতুল। বাবার মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতির ব্যবসা। দুই ভাই, এক বোনের মধ্যে অতুলই বড়। ওদের শৈশব-কৈশোরে কপিলদেব দুনিয়া কাঁপাচ্ছেন। "কপিলের খেলা দেখেই ক্রিকেটে আমার আগ্রহ জন্মায়। বাবাকে বলায় তিনি আমাকে তারক সিনহার ক্রিকেট-স্কুল সনেট ক্লাবে ভর্তি করে দিলেন।" কলকাতার ফুটবলে যেমন অচ্যুত ব্যানার্জি, দিল্লির ক্রিকেটে তেমনই তারক সিনহা। এই প্রবাসী বাঙালির শিষ্যদের মধ্যে আছেন রমন লাম্বা, সুরিন্দর খান্না, ভাস্কর পিল্লাই, অজয় শর্মা, সঞ্জীব শর্মা ও রণধীর সিংহের মতো ভারতখ্যাত কয়েকজন ক্রিকেটার। "আমার উচ্চতা দেখে সার আমাকে প্রথম থেকেই ফাস্ট বোলিং করাতে চাইলেন। আমার যা কিছু শিক্ষা সবই ওঁর কাছে। আউটসুইং হচ্ছে আমার সেরা অস্ত্র। তা ওঁর কাছেই শিখেছি। অনেক পরে অফ কাটার শিখিয়েছেন রাজিন্দর পাল।"

অতুলের 'আইডল' কপিলদেব এবং ডেনিস লিলি। "তবে হাতে-কলমে শিক্ষা যাকে বলে, ম্যাচের মধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কীভাবে কৌশল বদলাতে হবে তা শিখিয়েছেন মদনলাল। "মদনভাইয়ের' কাছে আমার ঋণ অনেক।" অনেকটা পথ পেরিয়ে অতুল এখন একটা বড় রাস্তার মোড়ে এসে থেমেছেন। এর পর তিনি দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিতে ছুটবেন কি না, তা জানার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ক্রিকেটের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়াও চালিয়ে গেছেন অতুল। আপাতত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-কম ছাত্র এবং বাবার 'প্র্যাকটিস পার্টনার'। একুশ বছরের অতুলের লক্ষ্য একটাই—ভারতীয় দলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জায়গাটা পাকা করা।

ফোটো : প্রীতিরঞ্জন কর্মকার

গাঁওয়ারের দুঃসময়

তাঁকে নিয়ে ভি· ডি· ও ক্যাসেটই বাজারে বেরোক বা কাউন্টিগুলো খেলবার জন্য টানাটানি করুক, ডেভিড গাওয়ারের সময় কিন্তু একদমই ভাল যাচ্ছে না । ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে প্রাক্তন ইংল্যান্ড দলনায়ক গাওয়ার বাদ পড়েছেন । সম্প্রতি এমন এক দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন যে, প্রাণ নিয়েই টানাটানি । সুইজারল্যান্ডে সেন্ট মরিস হ্রদের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলেন একটা ডিনারের পর । অন্যান্য গাড়ির চাকার দাগ দেখে ভাবেন বরফের আস্তরণ গাড়ির ভার নিতে পারবে । কিন্তু হঠাৎই বরফ ভেঙে যায় । কোনওরকমে গাড়ি থেকে লাফিয়ে জলে পড়ে প্রাণ বাঁচান গাওয়ার । ততক্ষণে অতলে তলিয়ে গেছে গাড়ি ।

আর মাত্র দু'বছর

নব্বই-এর দশকে যাঁকে একমাত্র পুরুষ টেনিস-তারকা হিসেবে ভাবা হচ্ছে, তাঁর সম্বন্ধেই কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা শুনিয়েছেন নিকি পিলিক । নিকি পশ্চিম জার্মানি ডেভিস কাপ দলের নন-প্লেয়িং অধিনায়ক । তার থেকেও বড় কথা, বরিস বেকারের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিকি জানিয়েছেন, 'বেকার আর দু' বছরের মধ্যেই টেনিস ছেড়ে দেবে । এই মানসিক এবং শারীরিক চাপ ও নিতে পারছে না ।' কয়েক কোটি টাকার মালিক তরুণ বেকার উইম্বলডন, অস্ট্রেলীয় ওপেন জিতলেও এখনও পর্যন্ত বিশ্বে এক নম্বর স্থানটি পাননি । সেই স্থানটি পেলেই কি তারুণ্যেই অবসর নেবেন বেকার ? নিকি জানিয়েছেন, বেকারের সুপ্ত ইচ্ছেটা অনেকটা সেরকমই ।

চ্যানেল নাইনের কাণ্ড

মাঠে বসে ক্রিকেট ম্যাচ না দেখলে আনন্দের অর্ধেকটাই মাটি । অস্ট্রেলিয়ানরা কথাটা মানতে চাইবেন বলে মনে হয় না । চ্যানেল নাইনের টেলিভিশন ক্যামেরা এত অসাধারণ খেলা দেখায় যে, মনে হয় টিভি-তেই সর্বদা চোখ রাখি ।

পেশাদারি-দক্ষতার চরম উৎকর্ষ দেখিয়ে ২৭টি কম্পিউটারাইজড ক্যামেরা কাজে লাগিয়ে চ্যানেল নাইন বোলিং অ্যাকশন থেকে শুরু করে, ব্যাটিং স্টাইল, সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখায় । এমনকী, ব্যাটসম্যানের প্যাডে লেগে ক্যাচ উঠলে উইকেটের কাছাকাছি লাগানো ছোট্ট মাইক্রোফোন সেই শব্দ ধরে নেয় । চ্যানেল নাইন এখন আরও একধাপ এগিয়ে উইকেটের সঙ্গে ক্যামেরাও লাগাবে ঠিক করেছে । ওই ক্যামেরা ব্যাটসম্যান ঠিকমতো ক্রিজে পৌঁছল কি না দেখিয়ে দেবে । ফলে রান আউট-এর সিদ্ধান্ত নিতে একটুও অসুবিধা হবে না আম্পায়ারের । অসুবিধায় অবশ্য পড়বেন কিছু খেলোয়াড় । যাঁরা 'আউট হইনি, অন্যায়' বলে রাগ দেখাতে দেখাতে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসেন, তাঁরা এবার চিন্তান্বিত হবেন !

মতামত

কলকাতা ফুটবলকে এখন মাতাচ্ছেন দুই নাইজিরিয়ান । চিমা ওকোরি এবং এমেকা এজুগো । আগামী বিশ্বকাপ ফুটবলে মাতাবেন কে ? দুই নাইজিরিয়ান কিন্তু এক্ষেত্রে এক । তাঁদের মতে রুড গুলিট বা মারাদোনা নন, হিরো হবেন অন্য এক তরুণ মার্কো ভ্যান বাস্তেন।

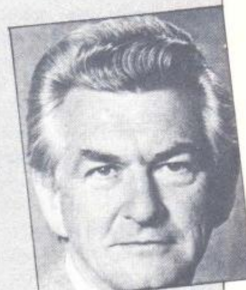

প্রধানমন্ত্রীর ধারাভাষ্য

অনেক রাষ্ট্রপ্রধানই খেলা ভালবাসেন কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী বব হক ক্রিকেটে একেবারে নিবেদিতপ্রাণ । ক্যানবেরায় তাঁর সরকারি বাসভবন 'দ্য লজ্'-এ বিদেশী ক্রিকেটদল সফর চলাকালীন একবার-না-একবার আমন্ত্রণ পাবেনই । কলেজে খুব ভাল ক্রিকেট খেলেছেন তিনি । অস্ট্রেলিয় ক্রিকেট দলনায়ক বর্ডারের সঙ্গে প্রায়ই ক্রিকেট- আলোচনা করেন । আর-একটি কাজও করেন, সময় পেলেই রেডিও এবং টিভি-তে ক্রিকেট ধারাভাষ্য দিয়ে থাকেন।

মহম্মদ আজহারউদ্দিন
ফোটো : উৎপল সরকার

সারনাথ, যেখানে সিদ্ধপুরুষ গৌতম বুদ্ধ তাঁর প্রথম উপদেশ প্রচার করেছিলেন....
4 দু:সাহসী ভারতবাসী
এখান থেকেই তাঁর দয়া, ধর্মাচরণ ও সংযমের বাণী সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল....!
আজকের জীবনে যা আমাদের ভীষণভাবে প্রয়োজন।
দু: সাহসী চার —— ইউসুফ নেতা, গুরুস্বামী বুদ্ধিদাতা, ন্যান্সি অনুসন্ধানী এবং সাহসী পরম। উত্তেজনা খোঁজে সবসময় এবং ভারতের সৌন্দর্যে মোহাবিষ্ট
"মহান পুরুষদের চিন্তাধারা যুগযুগ ধরে প্রেরণা জোগায়..."
সম্রাট অশোক
মহাত্মা গান্ধী
ড: আম্বেদকর
চীনে ও জাপানে-
ওই যে গুরু!
আরে! দু:সাহসী চার এখানে!
নইলে কোথায়!
হ্যালো, ছেলেরা।
আমরা আমাদের স্কুলের "ভারতের সৌন্দর্য সংরক্ষণ" গোষ্ঠীর সদস্য।
এবং এখানে, সারনাথে আমরা তাই করছি।
ROBIN

ন্যান্সি এবং পরম ছেলেমেয়েদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে....
তোমরা এখুনি এটা থামাও, নইলে আমরা রিপোর্ট করবো।
তোমরা কিছুতেই আমাদের ঐতিহ্যকে-তোমাদের নিজেদের ঐতিহ্যকে এভাবে নষ্ট করতে পারো না।
আমাদের অসাধ্য কিছুই নেই এবং তা নিশ্চিত।
পরে সকলে একসঙ্গে বসে দুপুরের খাবার খায়।
তোমাদের চারজন সম্পর্কে পড়েই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, ঐতিহ্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমাদেরও অবশ্যই সাহায্য করা উচিত।
এবং নিজেদের দেশের পর্যটন স্থানগুলো বেড়াতে বেড়াতেই আমরা সবচেয়ে ভালভাবে সে দায়িত্ব পালন করতে পারি।
আমরা এলাহাবাদ যাচ্ছি। এবং সেখান থেকে দিল্লী ও আগ্রা যাবো।
আমরা পরস্পরকে চিঠি লিখবো।
অবশ্যই।
টা-টা-ইউসুফ
শুভেচ্ছা নিও! যে ভাল কাজে আমরা হাত দিয়েছি তা যেন সবাই বজায় রেখে চলতে পারি।
নেহেরুজীর কথা ভুলো না— "ভারত মরিলে রহিবে কে?" আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।
আচ্ছা আবার দেখা হবে।
আমরা রক্ষা করতে পারি এবং করব
ভারতের মহান সৌন্দর্য
আপনাদেরও উচিত অবিবেচক লোকদের পরিবেশ নষ্ট করতে না দেওয়া। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে ভারতের সৌন্দর্যকে চিরকাল ধরে রাখতে পারব।

বেঙ্কটরামনা
ফোটো : উৎপল সরকার

মাঝমাঠের লড়াই

গৌতম সরকার.

পূর্ব প্রকাশিতের পর

আগেরবার লিখেছি, গোয়াকে ফাইনালে হারিয়ে ১৯৭৮ সালের সন্তোষ ট্রোফি জিততে আমাদের তেমন কোনও অসুবিধে হয়নি। মাঠে নয়, মাঠের বাইরের কিছু বাধার সামনে অবশ্য আমরা পড়েছিলাম। ডাবল লেগ সেমিফাইনালের প্রথমটায় হঠাৎই আমরা মহারাষ্ট্রের কাছে হেরে বসলাম। যদিও সেবারের মহারাষ্ট্র দল ছিল খুব ব্যালান্সড, ছিলেন অমর বাহাদুর, রণজিৎ থাপা প্রমুখ নামী খেলোয়াড়, তবুও প্রথমে গোল করে এগিয়েছিলাম আমরাই। শেষদিকে আমাদেরই ভুলে পর-পর দুটো গোল হজম করতে হল। অনেকদিন পর পরাজয়ের নোনা স্বাদ পেয়ে মুষড়ে পড়লাম ঠিকই, তথাপি জানতাম, সেকেন্ড লেগে প্রবল লড়াই করে আমরা ফিরে আসবই।

আমরা ভাবলাম এক, শুরু হল অন্য এক চক্রান্ত। কথা ছিল, ফাইনালের পর ১৯৭৮-এর এশিয়ান গেমসের জন্য ক্যাম্পে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হবে। কিন্তু কোনও কারণ ছাড়াই, প্রথম সেমিফাইনালের পরের দিনই নির্বাচিতদের নাম ঘোষিত হল। এবং কী আশ্চর্যের কথা, সেই তিরিশজনের দল থেকে আমি, শ্যাম, মিহির এবং মনোরঞ্জন বাদ! এক শ্রেণীর কর্মকর্তা বাংলাকে আরও বিপাকে ফেলার জন্য, দলে যাতে গোলমাল বেধে যায় তার জন্যই এই কাণ্ডটা করলেন। একে প্রথম লেগে হার, তার ওপর বাদ পড়ায় মন ভেঙে পড়ছিল, কিন্তু বাংলার সম্মান যেখানে জড়িত এবং আমরা চক্রান্তটা ধরতে পেরেছি যখন, তখন লড়াই ছেড়ে একজনও পালিয়ে আসিনি।

> আমিই যে শ্যামকে পছন্দ করি তা নয়, ক্লাব নির্বিশেষে ওকে সবাই ভালবাসে। ওর জনপ্রিয়তা বোধ হয় আমাদের সময়ের ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। কি ইস্টবেঙ্গল, কি মোহনবাগান—সকল দর্শকই ওকে মাথায় করে রেখেছিল।

তাই সেকেন্ড লেগে আমরাই জিতলাম, ফাইনালে গেলাম এবং চ্যাম্পিয়ান হলাম। কয়েকজন বাদ পড়লেও বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব আবার প্রমাণিত হল।

এই প্রসঙ্গে বাংলার বাইরের দর্শকদের সম্বন্ধে কিছু বলতেই হয়। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি, কলকাতায় যখন খেলা হল, দর্শকরা কিন্তু ভাল খেলাকে সর্বদাই অভিনন্দিত করেন। এবং নিজেদের দল বাজে খেললে প্রবল সমালোচনা করেন। অথচ বাইরে ঠিক উলটো ব্যাপার। বাংলা ফুটবল-দল সম্বন্ধে বেশিরভাগ দর্শকই কেন জানি না, শুধু সমালোচনাই করে যান। আমরা ভাল খেললে দর্শকদের অভিনন্দনের বদলে রাগের শিকার হই। দিল্লি, বম্বে বা যেসব জায়গায় বাঙালি আছেন সেসব ক্ষেত্রে আলাদা, কিন্তু অধিকাংশ জায়গার ছবিটাই এইরকম। আছেন মুষ্টিমেয় বোদ্ধা দর্শক, তাঁদের কথাও এক্ষেত্রে ধরছি না। কেন এরকম হয় বুঝতে পারিনি। ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখের। সারা ভারতেই মোটামুটি এই এক ব্যবহারে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

অদ্ভুতভাবে শ্রীনগরেও আমরা একই ব্যবহার পেলাম। অদ্ভুত বলছি এই কারণে যে, জম্মু ও কাশ্মির দলের সঙ্গে আমাদের খেলা ছিল না, ছিল মহারাষ্ট্র বা গোয়া ইত্যাদির সঙ্গে। শ্রীনগরের দর্শকদের তো উচিত ছিল নিরপেক্ষভাবে খেলা বিচার করে তারপর সমর্থন করা। তা না করে তাঁরা প্রথম থেকেই বাংলার বিরুদ্ধে চলে গেলেন। আমাদের উদ্দেশ্যে টিটকিরি, চেঁচানো ইত্যাদি শুরু হয়ে গেল। আমরা বারবার সন্তোষ ট্রোফি জিতেছি, অন্য দলগুলোকে হারিয়েছি— এটাই কি আমাদের দোষের কারণ? বাজে লেগেছিল, কিন্তু এর ফলে আমাদের নিজেদের ঐক্য আরও বেড়েছিল। শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ান হয়ে দেখিয়েছিলাম, মাঠের খেলায় আমরাই সেরা।

যেদিন গোয়াকে ফাইনালে হারালাম, সেদিন সন্ধ্যাতেই শ্যাম থাপা সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দিল, আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে তার অবসর নেওয়ার কথা। দুঃখে-ক্ষোভেই যে সে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শ্যাম আমাকে বলেছিল, "কতদিন আর এইভাবে অপমানিত হব বল গৌতম? ভারতের হয়ে ওরা যখন খেলতেই দেবে না, তখন রাজ্য, ক্লাব এদের দিকেই মন দেওয়া ভাল, তাই না?" শ্যামের আবেগকে খণ্ডাতে পারিনি। একই আবেগ তো আমাকেও গ্রাস করছিল। দেশের হয়ে লড়াই করার আগ্রহ, ইচ্ছা কীভাবে দমন করে দেওয়া হল।

অনেক খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলেছি, দেখেছি কিন্তু শ্যামের মতো ভদ্র, যাকে বলে

একেবারে 'জেন্টলম্যান' খুব কমই পেয়েছি। ব্যক্তিগত জীবনে ও আর আমি খুবই বন্ধু। সুধীরের মতোই ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। এখনও আমার পরিবারে কোনও অনুষ্ঠান হলে শ্যাম হল আমার প্রথম অতিথি। আমার মা, স্ত্রীর বিশ্বাস শ্যামকে দেখা মানেই অনুষ্ঠানের শুভ হওয়া। একেই বলে যোগাযোগ। নেপালের ছেলে শ্যাম এখন বাঙালি ঘরের শুভর প্রতীক। শ্যাম এটা জানে কি না জানি না, আমার স্বার্থেই যে ওকে আমি আসতে বলি আমার বাড়িতে, এটা জানলে ও হয়তো হাসতে শুরু করবে!

অবশ্য শুধু আমিই যে ওকে পছন্দ করি তা নয়, ক্লাব নির্বিশেষে ওকে সবাই ভালবাসে। ওর জনপ্রিয়তা বোধ হয় আমাদের সময়ের ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। কি ইস্টবেঙ্গল, কি মোহনবাগান— সকল দর্শকই ওকে মাথায় করে রেখেছিল। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান দু' দলের বিরুদ্ধেই যেসব গোল করেছে, তা সোনা দিয়ে বাঁধানো যায়। শ্যামের শুটিং ভাল ছিল না, কিন্তু টার্নিং অর্থাৎ ঘোরাটা ছিল বিদ্যুৎগতির। ওর অসাধারণ বাইসাইকেল কিকে কখনও ইস্টবেঙ্গল জনতা আত্মহারা হয়েছে জয়ের আনন্দে, কখনও মোহনবাগান জনতা। তিন কাঠিটা এত ভাল চিনত শ্যাম যে, পেনাল্টি বক্সে বল পেলে বিপক্ষ গোলরক্ষকের হৃৎকম্প শুরু হত। এসব অবশ্য নতুন কোনও কথা নয়, যারা ওর খেলা দেখেছে তারাই জানে।

কিন্তু অনেকেই জানে না, শ্যাম কীরকম 'টিমম্যান' ছিল। ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করে বলি। অনেক খেলোয়াড় আছে, যারা বড়, মাঠে নামে, নিজের খেলাটা খেলে চলে যায়। আবার অনেকে আছে, নিজের খেলা খেলতে খেলতেই প্রয়োজনে অন্যের সাহায্যে চলে আসে। ধরা যাক, একজন স্ট্রাইকার, তার কাজ বিপক্ষ ডিফেন্সের ফাঁক-ফোকর খুঁজতে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। কিন্তু দেখল, তার দলেরই ডিফেন্ডার বিপক্ষের কাছে নাজেহাল হচ্ছে। আক্রমণ রুখতে পারছে না। কোনও-কোনও আক্রমণভাগের খেলোয়াড় সেই সময় পিছিয়ে এসে সেই ডিফেন্ডারকে সাহায্য করে যায়। শ্যামের এই গুণটা ছিল। কথায় কথায় টোটাল ফুটবলের কথা বলা হলেও আমাদের দেশে খুব কম খেলোয়াড়ই সেটা অনুসরণ করে বা করতে পারে। নিজের জায়গাতেই খেলতে হয়। শ্যাম যেটা করেও, দলের স্বার্থে যেখানে দরকার চলে যেত। এটাই টিমম্যানের গুণ।

বন্ধু শ্যাম আর আমি

আর-একটা দিক দিয়েও শ্যাম দারুণ টিমম্যান। দলের কোনও খেলোয়াড় যদি শারীরিক বিপদেও পড়ত সবার আগে ছুটে আসত শ্যাম। তার জ্বলন্ত উদাহরণ আমি। ১৯৭৫ সালের রোভার্স কাপের খেলা হচ্ছে ছিয়াত্তরে। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে জে সি টি-র। আমাদের এক খেলোয়াড়কে বিশ্রীভাবে ফাউল করেছিল ওদের এক ডিফেন্ডার। কাছেই ছিলাম আমি। রাগের চোটে ছুটে গিয়ে সেই প্লেয়ারটিকে ধাক্কা দিলাম। অন্যায় করেছি বুঝতে-না-বুঝতেই দেখি ওদের চার-পাঁচজন খেলোয়াড় আমাকে ঘিরে ধরেছে মারবার জন্য। জাগির সিং আমার জামা চেপে ধরেছে। হঠাৎ দেখি কোথা থেকে ওই ভিড়ের মধ্যে উড়ে এসে পড়ল শ্যাম। এমন ক্যারাটে চালাল যে, সব চারদিকে ছিটকে পড়ল। রেফারি পরে এসে সতর্ক করে দিলেন সবাইকে।

এই হল শ্যাম। সহ-খেলোয়াড় বা বন্ধুর বিপদে নির্ভীকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ত। অথচ এমনিতে কী শান্ত ছেলে। জীবনে ক'টা ফাউল করেছে গুনে বলা যায়। মার খেলেও কিছু বলত না। কিছু বলতে পারেনি বলেই বোধ হয় এখানে যথার্থ সম্মান ও পেল না। বাংলার অধিনায়ক করা হয়নি শ্যামকে— এটা লিখতেই আমার লজ্জা করছে। অবশ্য জনপ্রিয়তা ও ভালবাসা পাওয়ায় শ্যাম সবার আগে, সেখানে ও অধিনায়ক নয়, একেবারে সুপারহিরো! (ক্রমশ)

অনুলিখন : তানাজি সেনগুপ্ত

মরসুমের প্রথম খেলায় রোভার্সের অবিশ্বাস্য হার হলেও টাকা দিয়ে বাজার থেকে খেলোয়াড় কিনতে রয় রাজি হয়নি। পরে, রোকফোর্ডের সঙ্গে রোভার্সের 'এ' টিমের খেলায় কেনি লোগানের দক্ষতা যাচাই করতে গিয়ে অন্য একটি খেলোয়াড় রয়ের নজর কেড়ে নিল···
ও কী করতে চাইছে···মাঠের সব খেলোয়াড়কে হারাবে ?
অন্যকে বল দাও, খোকা ! এত স্বার্থপরতা ভাল নয় !
রোভার্সের রয়
কালো ছেলেটির সহ-খেলোয়াড়রা বল চাইছিল !
অ্যান্ডি, এবার বল দাও !
আচমকা ক্রসে মেলচেস্টার বিপন্ন !
কিন্তু !
উহুহু !
এই ওর স্বভাব ! খেলাটা যে দলগত লক ছেলেটা তা বুঝতে চায় না !
মনে হয় গোলটা ও একাই করতে চেয়েছিল ! দুঃখের কথা, রয়··· অথচ ছেলেটার প্রতিভা আছে !
কথাটা ঠিক !
আমি যা বুঝতে পারি না তা হল রোভার্সের প্রতিভা আবিষ্কারের ব্যবস্থা সর্বোত্তম··· তা হলে অ্যান্ডি লক ছেলেটার কথা আগে শুনিনি কেন ?
উফ্ !
দেরিতে বিশ্রী ট্যাক্‌ল্ !
এটাই কারণ ! ও অত্যন্ত লোভী, দাম্ভিক আর বেপরোয়া !
কিন্তু রয়ের সন্দেহ ছিল !
হয়তো এটা নিছক অতি উৎসাহ ! খেলার মধ্যে সারাক্ষণ ডুবে থাকার ইচ্ছা !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়) ☐

বিশ্বকাপ হকি জিতবে কি ভারত

বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন **সুব্রত সরকার**

ভারতের কি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার কোনও সম্ভাবনা আছে? অবশ্যই ফুটবলের কথা হচ্ছে না। গত তিনবারের মতো এই বছরেও ফুটবলের বিশ্বকাপের আগে খেলা হচ্ছে হকির বিশ্বকাপ। তবে বিশ্বকাপই যেমন ফুটবলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা, হকির ক্ষেত্রে সাধারণের দৃষ্টিতে ওলিম্পিক টুর্নামেন্টটাই সবচেয়ে বড়। বিশ্বকাপ হকির সময়ে আমরা তাই তেমন উত্তেজিত হই না!

আগের ছ'টি বিশ্বকাপ হকি টুর্নামেন্টের মধ্যে ভারত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে একবার। পনেরো বছর আগে, কুয়ালালামপুরে। তবে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ১৯৮৬ বিশ্বকাপে বারোটি অংশগ্রহণকারী দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল দ্বাদশ। লাহোরে ১২ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি যে প্রতিযোগিতা হবে তাতে ভারতের জেতার সুযোগ কতটা আছে তা না ভেবে এটা আশা করা যাক, প্রথম ছ'টি দলের মধ্যে যেন আমরা থাকতে পারি।

গত বছরের দুই বড় প্রতিযোগিতা—বার্লিনের চ্যাম্পিয়ানস ট্রোফি আর আমেরিকার নিউ জার্সিতে অনুষ্ঠিত ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ—খেলা হয়েছিল 'পলিগ্রাস' মাঠে। লাহোরে ম্যাচগুলি হবে 'অ্যাস্ট্রোটার্ফ-এর ওপর। ওলিম্পিক হকি যদিও ১৯৭৬ থেকেই কৃত্রিম সার্ফেসে খেলা হচ্ছে, ১৯৮৬ লন্ডন টুর্নামেন্টের আগে পর্যন্ত হকির সব বিশ্বকাপ ঘাসের মাঠে খেলা হয়।

শেষ ক'টি বড় প্রতিযোগিতায় লক্ষ করা গেছে, ভারত আরম্ভ করে বেশ সুন্দরভাবে, তবে টুর্নামেন্টের পরের দিকে টিম যেন কেমন দমে যায়। বার্লিনে ভারত প্রথম খেলাতে পশ্চিম জার্মানিকে হারায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলের স্থান হয় সবার পরে। লাহোরে ভারতের প্রথম খেলা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে, তারপর আর্জেন্টিনা আর ফ্রান্স। নিউ জার্সিতে ভারত ফ্রান্সকে ৩—২ হারিয়ে তৃতীয় স্থান নিয়েছিল।

লাহোরে ভারতের 'এ' গ্রুপের শক্তিশালী দুই দল হল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে হবে পর পর দু' দিনে, আর সেখানেই হয়তো হবে দলের প্রকৃত শক্তি পরীক্ষা।

গত বিশ্বকাপে পাকিস্তান ভারতের চেয়ে সামান্য ওপরে ছিল, ১১ নম্বর স্থানে। তবে '৯০-এর বিশ্বকাপ লাহোরে হবে বলে তারা সরাসরি খেলার অধিকার পায়, লন্ডন টুর্নামেন্টের প্রথম ছ'টি দলের মতন। বাকি পাঁচটি অংশগ্রহণকারী দেশ নিউ জার্সির ম্যাডিসনে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে লাহোর পৌঁছেছে। হল্যান্ড, ভারত আর ফ্রান্স বাদে কানাডা আর আয়ারল্যান্ড বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। এই প্রথম ভারতের হকির বিশ্বকাপে সরাসরি খেলবার যোগ্যতা ছিল না।

ভারতীয় ফরোয়ার্ড লাইন এখনও কার্যকর নয়
ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

লাহোর বিশ্বকাপে জেতবার সম্ভাবনা হয়তো অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বেশি। লন্ডন বিশ্বকাপ তারাই জেতে।

নজর থাকবে জুড ফেলিক্সের দিকে

জুড ফেলিক্স খেলেন রাইট ইন সাইডে। আধুনিক হকিতে রাইট ইন সাইডের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃত্রিম সার্ফেসে অধিকাংশ আক্রমণই হয় এই দিক থেকে। তা ছাড়া, রাইট ইন সাইডের খেলোয়াড়ই 'গেম মেকার'। তিনি নিজে যেমন আক্রমণে যান, তেমনই আবার সহখেলোয়াড়দেরও বল বাড়ান। বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতায় ভারতের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে জুড ফেলিক্সের ওপর।

ভারতীয় হকিতে রাইট ইন সাইড ছিলেন মারউইন ফার্নাডেজ। ঢাকায় এশিয়া কাপের পর তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তারপর রাইট ইন সাইড পজিশনে কয়েকজন খেলোয়াড়কে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর পর জুড ফেলিক্সকে দেওয়া হয় এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি। তিনি খেলেন রেলওয়েজ দলে। তবে, জুড ফেলিক্সের সমস্যা একটাই। এই অল্প বয়সে এত চাপ তিনি নিতে পারবেন কি না এ নিয়ে অনেকেই সন্দেহ করেছেন।

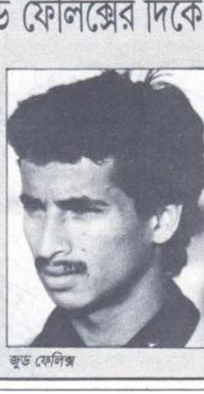

জুড ফেলিক্স

পাকিস্তানের শাবাজ রাইট ইন সাইডে খেলেন। তবে বিপক্ষের খেলোয়াড়রা তাঁকে দারুণভাবে পাহারা দিতে শুরু করায় পাকিস্তান দল শাবাজকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানা জায়গায় খেলান। ফলে তাঁকে পাহারা দিতে গিয়ে বিপক্ষের খেলোয়াড়রা হিমশিম খেয়ে যান। শাবাজ নিজে একজন বড় মাপের খেলোয়াড়, যে-কোনও জায়গা থেকেই তিনি বিপক্ষের বিপদের কারণ হয়ে ওঠেন। এখন জুড ফেলিক্স কী করেন সেটাই দেখার।

ধারাবাহিক উপন্যাস

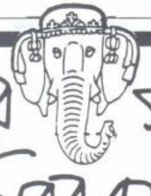

সোনার গণপতি হিরের চোখ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

শুভঙ্কর বলল, "যদি আমার কথা শোনো তা হলে বলি, ওই সোনার গণপতি সত্যিই যদি ইতিমধ্যে তোমাদের হস্তগত হয় তা হলে ডায়েরির নির্দেশ অনুযায়ী ওকে তোমরা যথাস্থানে দিয়ে এসো। কেননা, অভিশাপের বোঝা আর বাড়িও না। পারো তো যাবার আগে একটি বুলেট খরচা করো ওই নরহন্তা শিকারি বাজের জন্য। এতে তোমাদের মঙ্গল হবে।"

কড়ি বলল, "তুমি বেশ ভাল কথা বলো তো ভাইটি। তুমি প্রকৃতই বুদ্ধিমান। তবে শোনো, ওই সোনার গণপতি সত্যিই যদি আমরা উদ্ধার করতে পারি তা হলে রাবণ হ্রদে নয়, রাবণ হ্রদ ডিঙিয়েও আরও দূরে-দূরান্তরে চলে যাব আমরা। যেখানে শুধু শিকারি বাজ কেন, ওর মৃত বাবাও আমাদের নাগাল পাবে না।"

শুভঙ্কর বলল, "গণপতি তোমাদের সুবুদ্ধি দিন। কিন্তু ওই শয়তান শিকারি বাজের কী হবে?"

"মৃত্যু। যাবার আগে আমরাই ওর গোপন ঘাঁটির কথা পুলিশকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে যাব। তা হলে হবে কি, পুলিশ আমাদের পিছু নেবার বদলে ওকে খুঁজে বার করার দিকেই নজর দেবে বেশি। আর সেই সুযোগে আমরাও যেদিকে দু'চোখ যায় পালিয়ে যাব।"

শুভঙ্কর বলল, "সত্যিই যদি তোমরা সেকাজ করতে পারো, তা হলে জানব, তোমরা আমাদের শত্রু নও। অন্তত তোমরা দু'জন। তার কারণ, আমরা চাই শিকারি বাজ ধ্বংস হোক। কাজেই, যে-লোক তার সর্বনাশের কথা চিন্তা করবে, যে-লোক তার ক্ষতি করতে এগিয়ে আসবে, সে কখনও আমাদের বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।"

"তা হলে এইবার বন্ধুর মতো বলে ফ্যালো দেখি ওই সোনার গণপতি কোথায় আছে?"

"এখনও তোমার অবিশ্বাস? বললাম তো জানি না। তোমাদের মতো আমরাও খুঁজছি। তোমরা ভাল করে খোঁজো, ঠিক পেয়ে যাবে। তবে বন্ধু! একবার শুধু বলো, আমার বন্ধু বিল্টু আর তিন্নি কোথায়?"

কড়ি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সেকথা জেনে লাভ কী বলো? তোমার বন্ধু বিল্টুকে শিকারি বাজ চিলকিগড়ের জঙ্গলে বন্দী করে রেখেছে। সোনার গণপতি ওর হাতে এলেই কনকদুর্গার মন্দিরে বলি দেবে ওকে।"

"সে কী! তিন্নি! তিন্নির কী হবে তা হলে?"

"তা তো বলতে পারছি না। এমনকী তাকে যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে ওরা, তাও জানি না। তবে এটুকু জেনে রেখো, সোনার গণপতি কোথায় আছে তা জানবার জন্য অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে ওদের ওপর।"

শুভঙ্কর বলল, "ওদের খবর দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি কালই আমার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে যেভাবেই হোক, উদ্ধার করব ওদের। তোমরাও আজ রাতের মধ্যে যা করবার তা করে নাও।"

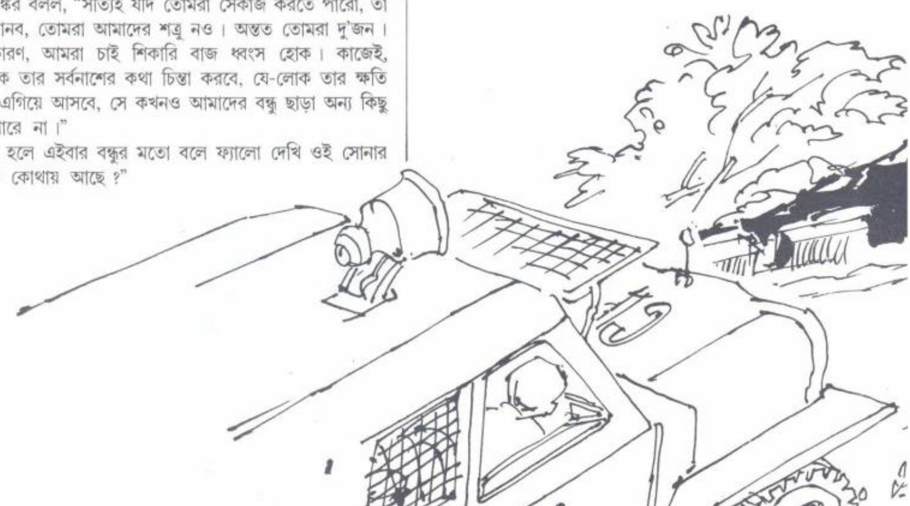

এমন সময় নীচে থেকে দারোগাবাবুর গলা শোনা গেল, "কী হল শুভঙ্কর ! এত দেরি করছ কেন ? বেশি দেরি হলে ট্রেন ফেল হয়ে যাবে কিন্তু ।"

শুভঙ্কর বলল, "আমার ডাক পড়েছে । আমাকে যেতে হবে । দোহাই বন্ধু ! তোমরা মউয়ের ক্ষতি কোরো না । ওকে কোনও কষ্ট দিও না ।"

"তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো ।"

"তোমার কথা বিশ্বাস করলাম । কিন্তু আমি কি একবার ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি ?"

"না । তাতে দেরি হয়ে যাবে । তা ছাড়া আমার সঙ্গী ভচুও হয়তো এ-ব্যাপারটা খুব একটা ভালভাবে মেনে নেবে না ।"

"তা হলে ওকে বলে দিও পুলিশ জোর করে আমাকে নিয়ে গেছে । না হলে ও হয়তো আমাকে ভুল বুঝবে ।"

"ঠিক আছে, যাও ।"

শুভঙ্কর আর একটুও দেরি না করে নীচে নেমে এল । পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করছিল ওর জন্য । ও পুণ্ডরীককাকা ও কাকিমাকে প্রণাম করে বলল, "আপনারা কিছু ভাববেন না । আমি বাবাকে নিয়ে শিগগির ফিরে আসছি । বাবা যদি এই খবর পেয়ে বাড়ি এসে থাকেন, তা হলে কালই সকালের ট্রেনে আবার আমি ফিরে আসব ।"

পুণ্ডরীককাকা ও কাকিমা শুভঙ্করকে চোখের জলে বিদায় দিয়ে

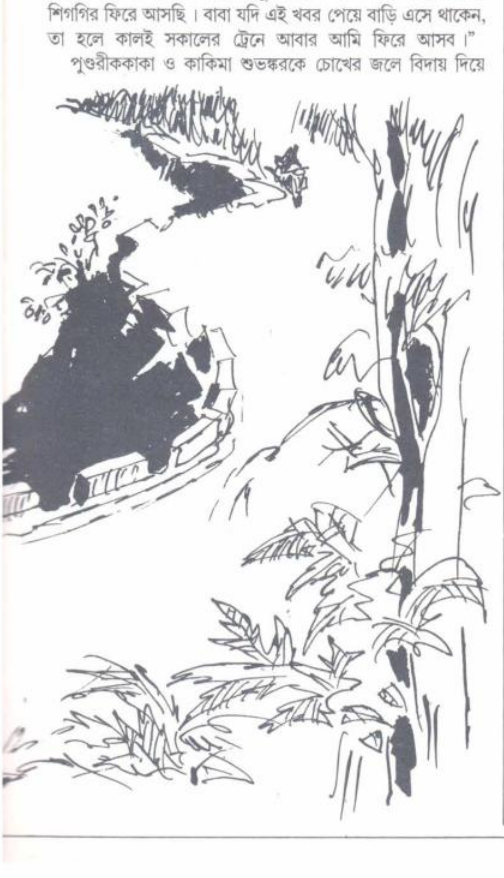

বললেন, "তাই এসো বাবা ।"

পুলিশের গাড়ি গ্রামের পথ ছেড়ে বম্বে রোডে এসে পড়ল । শুভঙ্করের মানসিক অবস্থাটা তখন এমনই যে, তা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না । কেননা, মউকে ওইভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে স্বার্থপরের মতো চলে যেতে কী কষ্ট যে হচ্ছিল ওর তা একমাত্র ভগবানই জানেন । ওর বুকের মধ্যে একটা অসহ্য ছটফটানি ওকে যেন অস্থির করে তুলল । অথচ মজাটা এই, এসব কথা পুলিশকে বলা যাবে না । বললে হয়তো ভচু আর কড়ি নামের দুই শয়তানকে এক্ষুনি হাতেনাতে ধরে ফেলা যাবে কিন্তু পরিণামে পাওয়া যাবে প্রাণচঞ্চল মউয়ের রক্তাক্ত মৃতদেহ । ওরা শুধু একবার নয়, একাধিকবার বলেছে বিশ্বাসঘাতকতা করলে ওদের পিস্তল থেকে একটিমাত্র গুলি খরচ করতে এতটুকুও কার্পণ্য করবে না ওরা । শুভঙ্করের মাথার ভেতরে যেন ঝিমঝিম করতে লাগল । এত স্বপ্নের, এত আশার সোনার গণপতি, সে যে কার ভাগ্যে আছে তা কে জানে ? এত কাণ্ডের পর সত্যিই কি সেটা বেহাত হয়ে যাবে ? ওদের মনে তো কোনও কুমতলব নেই । তা হলে ? তা হলে কেন ওই অভিশপ্ত বিগ্রহ ওদের ধরা দিচ্ছেন না ? তিনি সিদ্ধিদাতা । তাঁর তো উচিত ওদের মনোবাসনা সিদ্ধ করা । কিন্তু ওই দুষ্কৃতীরা ! ওরা যদি একবার ওই জিনিস হাতে পায় তা হলে ভেঙেচুরে খুবলেখাবলে কী যে অবস্থা করবে ওর তা কে জানে ? আর ওই চিলকিগড়ের জঙ্গল ? তাই বা কত দূরে ? ওর তো মানচিত্র-জ্ঞান নেই এই অঞ্চলের । সেই জঙ্গলে কোথায় যে কনকদুর্গার মন্দির তা কে জানে ? যূপকাষ্ঠে বলির পশুর মতো মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে যে বিল্টু, তাকেই-বা ও উদ্ধার করবে কী করে ? ও যদি পুলিশকে বলেও ফ্যালে সেকথা, তা হলেই কি পুলিশ বিশ্বাস করবে ? বরং চাপের পর চাপ দিয়ে বারবার জানতে চাইবে কোথা থেকে এবং কীভাবে এই কথা জানতে পারল শুভঙ্কর । আর তখনই ফাঁস হয়ে যাবে সব কিছু । তখনই গুলিবিদ্ধ মউয়ের বুক থেকে রক্ত ঝরবে ঝরঝর করে । তারপর··· । আর ভাবতে পারে না শুভঙ্কর ।

ওদের জিপটা হাওয়ার গতিতে উড়ে চলেছে ঘাটশিলার দিকে । যেতে-যেতে হঠাৎই দেখতে পেল শুভঙ্কর দূরে বহু দূরে আকাশ, পাহাড় ও শালবন যেখানে এক হয়ে গেছে, সেইখানে এক উচ্চস্থানে হিলকার্টের রুপোলি ফিতের মতো ঢালু পথ বেয়ে লাল রঙের একটা বাইক নিয়ে কে যেন দুরন্ত গতিতে এগিয়ে আসছে । খুব ভাল করে তাকে লক্ষ করল শুভঙ্কর । একটু পরেই সে আরও কাছে এগিয়ে আসতেই দেখতে পেল তাকে । ও তো বুদ্ধু ! বুদ্ধুদা । ওই তো অমন বেপরোয়ার মতো বাইক নিয়ে ছুটে আসছে । ওকে দেখেই যেন একটু আশার আলো দেখতে পেল শুভঙ্কর । দারোগাবাবুকে বলল, "সার ! অনুগ্রহ করে ওই বাইটাকে একবার থামাবেন ? ওই লোকটিকে আমার ভীষণ দরকার । একবার ওর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দিন ।"

"কে ও ?"

"আপনি চিনবেন না । খুব ভাল ছেলে । ওর নাম বুদ্ধু ।"

"কাল শশিমাস্টারের মেয়ে ওরই মোটরবাইক নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ ।"

"বুঝেছি । এ তো তামুকপালের ফ্যাক্টরিতে কাজ করে । সেখান থেকেই আসছে বোধহয় । সাট্টা আর জুয়া ছাড়া কিছুই বোঝে না বাছাধন । রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত গ্যাঙকুলিগুলোর সঙ্গে তাসের জুয়া খেলে ।"

"যে যা করে করুক। ওকে আমার চাই। খুব দরকার। একবার ওকে থামান।"

পুলিশ সঙ্গে-সঙ্গে হাত দেখিয়ে গতি রোধ করল বুদ্ধুর। বুদ্ধু একটা ঝাঁকানি দিয়ে বাইকটা থামাল। ওর গা বেয়ে তখন দরদর করে ঘাম ঝরছে। লাল বাইকের সিটে গোল কালো চেহারার বুদ্ধুকে দেখাচ্ছে মন্দ না। ভয়ে ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

শুভঙ্কর জিপ থেকে লাফিয়ে নেমেই ছুটে গেল ওর কাছে। তারপর ওর হাত ধরে ওকে একটু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, "তুমি এদিকে কোথায় গিয়েছিলে বুদ্ধুদা?"

"কাজে গিয়েছিলাম। তামুকপালে।"

"এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"কেন! কী হল?"

"মউয়ের খুব বিপদ।"

"সে কী!"

দারোগাবাবু বললেন, "শুভঙ্কর! তুমি কিন্তু নানা অছিলায় খুব দেরি করছ। যাবার ব্যাপারে তোমার দেখছি একদম গা নেই। এর পরে ট্রেন না পেলে কিন্তু যাচ্ছেতাই ব্যাপার হয়ে যাবে একটা।"

শুভঙ্কর বলল, "কিচ্ছু হবে না।"

"তুমি তো এক কথায় বলে দিলে কিচ্ছু হবে না। কিন্তু আমি কি কৈফিয়ত দেব?"

শুভঙ্কর বলল, "ধরুন, যে-সময় আপনি আমার খোঁজে গেলেন ঠিক সেই সময় আমি যদি বাড়িতে না থাকতাম? তা হলে কী করে আমাকে নিয়ে যেতেন আপনি?"

"তুমি দেখছি কথার মাস্টার। নাও, তোমার কথাবার্তা যা বলবার একটু তাড়াতাড়ি সেরে নাও।"

শুভঙ্কর বুদ্ধুকে আরও একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, "বুদ্ধুদা, এরা আমাকে জোর করে এক্ষুনি কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। অথচ আমি যদি এই মুহূর্তে চলে যাই, তা হলে মউকে হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। দারুণ বিপদে পড়ে যাবে ও। এদিকে বিল্টু আর তিন্নির কোনও খোঁজ নেই। তবে একটা কথা আমার কানে এসেছে শিকারি বাজ বিল্টুকে নাকি কনকদুর্গার মন্দিরে লুকিয়ে রেখেছে।"

"বলো কী! কনকদুর্গার মন্দির তো এখান থেকে অনেক দূর। গভীর জঙ্গলের ভেতর। দিনের বেলাতেও গা-ছমছম করে।"

"সেই জন্যই তো বলছি বুদ্ধুদা, তুমি একটা উপায় বার করো।"

"কী উপায় বার করব বলো? শিকারির সঙ্গে আমি পেরে উঠব না। ওর মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে গেলে আমাকেই ও মেরে ফেলবে।"

"তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। তোমার বাইকে আমাকে চাপিয়ে নিয়ে এই মুহূর্তে তুমি পালিয়ে চলো এখান থেকে।"

"তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে? ও কাজ করলে পুলিশ আমাকে রক্ষে রাখবে? তা ছাড়া পুলিশের জিপও তো পিছু নেবে আমাদের। আর আঁকাবাঁকা পথেই যে পালাব তাতেই বা পার কোথায়? ধরা যখন পড়ব তখন পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দেবে। এর ভেতরে আমি নেই ভাই। পুলিশের সঙ্গে শত্রুতা আমি চাই না।"

শুভঙ্কর বুদ্ধুর হাত দুটো ধরে বলল, "তোমার কোনও ভয় নেই। কাল সকাল পর্যন্ত তুমি একটু গা-ঢাকা দিয়ে থেকো। তারপর আমি বাবাকে বলে পুলিশ যাতে তোমাকে কিছু না বলে সে ব্যবস্থা করে দেব। কেননা, এই মুহূর্তে আমি যদি কলকাতায় চলে যাই তা হলে কী যে হতে পারে তা আমিও ভেবে পাচ্ছি না। অবশ্য আমি থেকেও যে খুব একটা কিছু করতে পারব তা নয়। তবে সত্যি বলতে কি, মনের দিক থেকে আমি বড় একা এবং অসহায় হয়ে যাব।"

"তুমি কী বলতে চাইছ বা কেন যে এত ছটফট করছ আমি কিন্তু তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছি না।"

"এখনই সেসব কথা তোমাকে বলা যাবে না। তা হলে তো পুলিশকেই বলতাম। পরে অবশ্য তোমাকে সব বলব। প্লিজ, একটু চেষ্টা করো।"

বুদ্ধু এবার গম্ভীর হয়ে একটু কী যেন ভাবল! তারপর বলল, "দ্যাখো, এই পুলিশদের চেয়ে তোমার বাবা উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার, তা আমি জানি। কাজেই তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে আমি ভয় পাই না। তবে কী জানো, তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার পর যদি তোমার কোনও বিপদ ঘটে তখন আমি যে তোমার ইচ্ছায় তোমাকে নিয়ে গেছি এ-কথা বোঝাব কাকে? সেই সময় আমার অবস্থাটা কী হবে একবার চিন্তা করে দ্যাখো তো? তবে একটা উপায় আছে।"

"কী উপায়?"

"কোন গাড়িতে যাচ্ছ তুমি?"

"ইস্পাত এক্সপ্রেসে।"

"ঠিক আছে, চলে যাও।" বলে খুব চাপা গলায় শুভঙ্করের কানের কাছে মুখ এনে কী যেন বলল বুদ্ধু।

কথাটা মনঃপূত হল শুভঙ্করের। তাই খুশির আলোকে ভরে উঠল ওর মুখ। বলল, "ঠিক তো?"

"কথা দিলাম। তোমার জন্য এইটুকু আমি করতে পারি। তবে সাবধান। এ-কথা কখনও যেন ফাঁস না হয়।"

পুলিশের জিপ তখন ঘনঘন হর্ন দিচ্ছে।

শুভঙ্কর বুদ্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে জিপে উঠল। জিপ ঝড়ের গতিতে তামুকপালের ওপর দিয়ে কাশিদা পার হয়ে রঙ্কিণী মন্দিরের গায়ে ঘাটশিলা থানায় এসে থামল। তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। কিন্তু আকাশের পট থেকে দিনের আলো একেবারেই মুছে যায়নি।

(ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

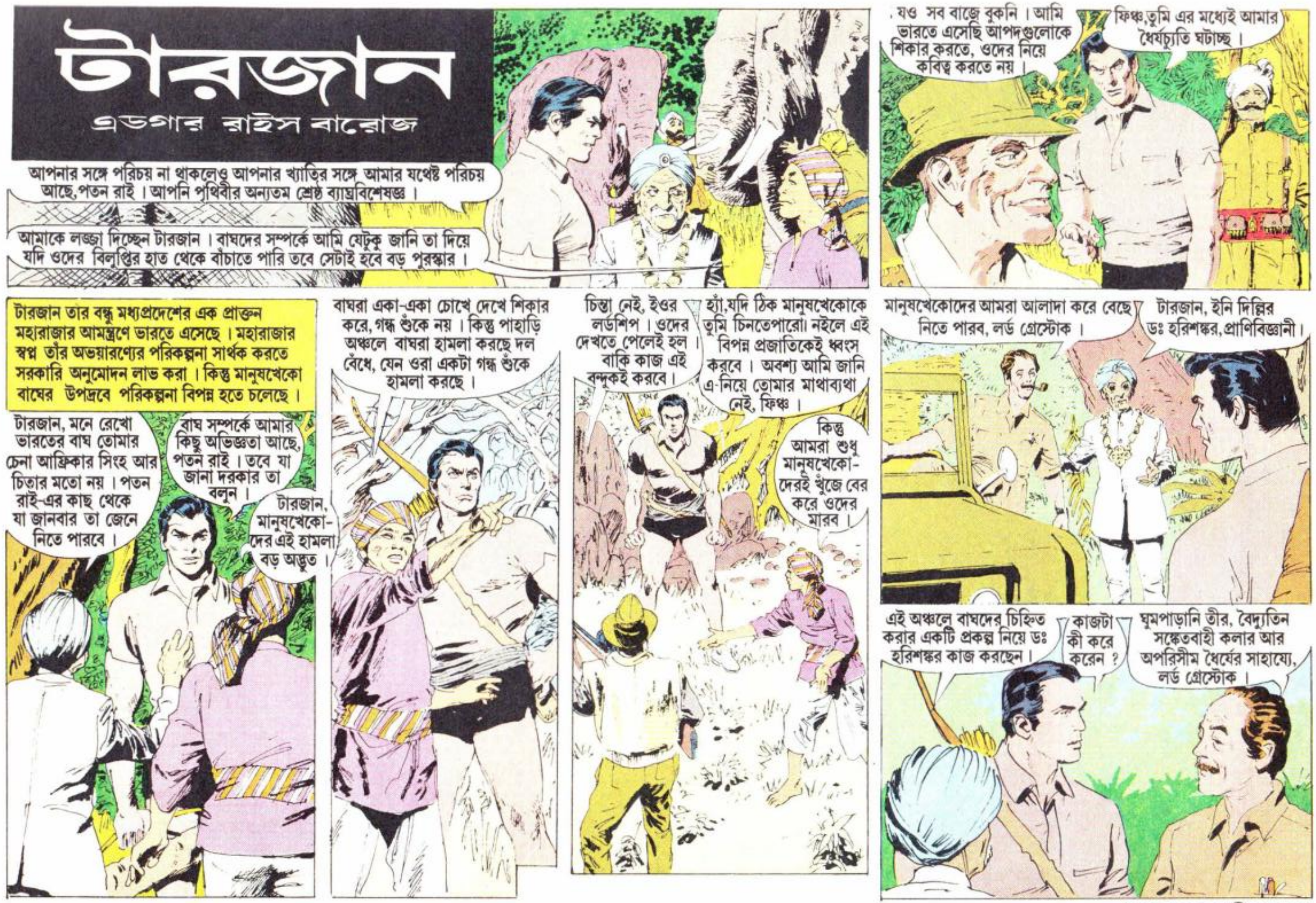

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

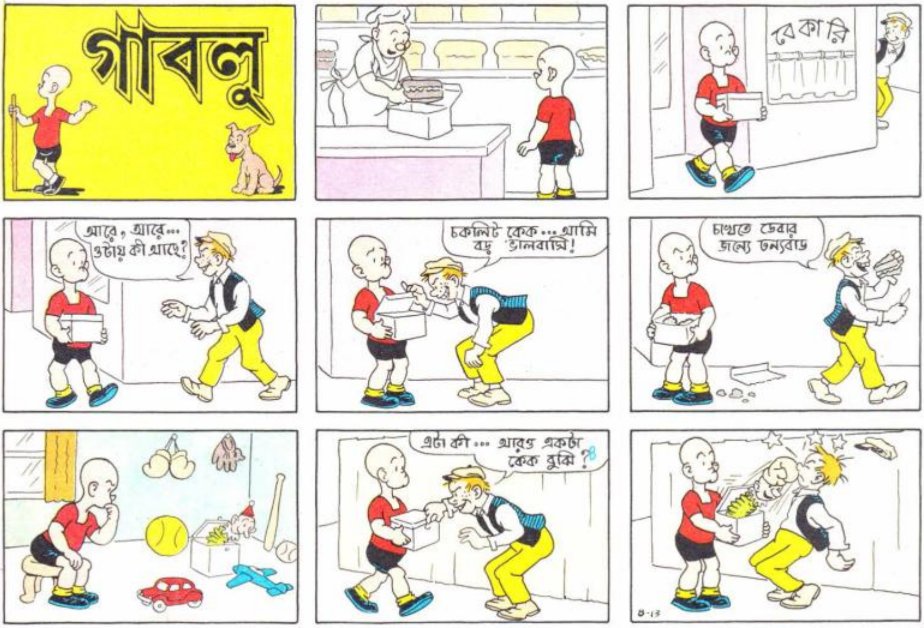
গাবলু
বেকারি
আরে, আরে... ওটায় কী আছে?
চকলিট কেক... আমি বড় ভালবাসি!
চাখতে দেবার জন্যে ধন্যবাদ
এটা কী... আরও একটা কেক বুঝি?

গাবলু

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতিপক্ষকে আঘাত করার একটি কৌশল

গত সংখ্যা থেকে আমি হাত দিয়ে মারের কৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি, জাপানি ভাষায় যার নাম 'সুতো'। পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এই সুতোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সুতো অনুশীলনের সময় বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যেন হাতের আঙুলগুলো পাশাপাশি ঠিকভাবে সাজানো থাকে। আঙুলগুলো বেশ শক্ত করে রাখতে হবে। এবার আমি যে সুতোর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব তার জাপানি নাম হল 'সুতো গামেন উচি'।

সুতো গামেন উচি : সুতো কথার অর্থ আগেই বলেছি। 'গামেন' কথার অর্থ হল মুখমণ্ডল, উচি' কথার অর্থ হল আঘাত করা। এই পদ্ধতিটি অনুশীলনের সময় কানের ওপরের অংশ লক্ষ্য করে আঘাত করার চেষ্টা করা উচিত।

প্রথমে আগের মতো ইওইদাচিতে দাঁড়াতে হবে। তারপর হাত ও পায়ের অবস্থান পরিবর্তন করে ঠিকভাবে সানচিনদাচিতে দাঁড়াতে হবে। এবার সানচিনদাচির হাতের অবস্থার পরিবর্তন করে বাঁ হাতটাকে আগে (মুখের সামনে) নিজের রগের উচ্চতায় কনুই থেকে মুড়ে আঙুলগুলো ঠিকভাবে শক্ত করে রেখে শরীরের ওপর ভাগ কোমর থেকে ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রি ঘুরিয়ে বাঁ হাতের তালু ওপর দিকে রেখে দাঁড়াতে হবে এবং সেই সঙ্গে ডান হাতটা ডান পাঁজর স্পর্শ করে রাখতে হবে। ঠিকভাবে দাঁড়ানো হলে তারপর ডান হাত দিয়ে শুরু করতে হবে। প্রথম অবস্থা থেকে বাঁ হাতটাকে নামিয়ে এনে ডান হাত যেখানে ডান পাঁজর স্পর্শ করে রাখা ছিল, সেখানে আনতে হবে। বাঁ হাতটা শরীর স্পর্শ করে থাকবে, সেইসঙ্গে ডান হাতটাকে প্রথম অবস্থা থেকে তুলে ডান দিকে কানের পেছনে নিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু মাথা স্পর্শ করবে না। এবার

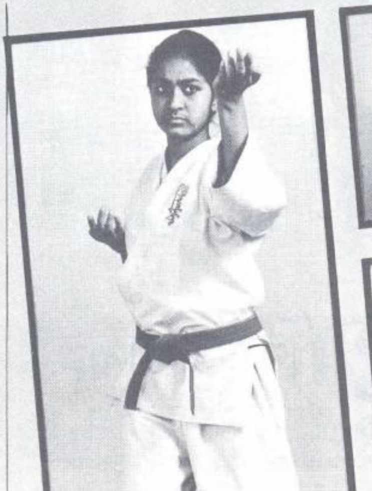

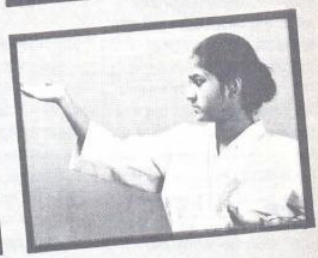

ডান হাতটা কানের পেছন থেকে ঘুরিয়ে সামনের দিকে এনে আঘাত করতে হবে। কনুই থেকে একটু মোড়া থাকবে। সেইসঙ্গে বাঁ হাতটা সরে এসে বাঁ দিকে পাঁজর স্পর্শ করবে। ডান হাতটা যখন কানের পেছনে রাখা থাকবে তখন ডান হাতের আঙুলের অবস্থান মাটির সঙ্গে উলম্ব ভাবে (বুড়ো আঙুলটা নীচে) থাকবে এবং ডান হাতের কনুই থেকে ডান হাত শরীরের সঙ্গে যেখানে যুক্ত সেই অংশ পর্যন্ত মাটির সঙ্গে অনুভূমিকভাবে সমান্তরাল অবস্থায় থাকবে। ডান হাতটা যখন কানের পেছনে থাকবে তখন কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশ ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রি ঘুরে থাকবে। যখন ডান হাতটা সামনে এসে আঘাত করবে তখন কোমর থেকে শরীরের ওপর অংশ বাঁ দিকে ৪৫ ডিগ্রি ঘুরে যাবে।

এরপর আবার বাঁ হাত তারপর ডান হাত—এইভাবে প্রতি হাতে কুড়িবার করে অনুশীলন করতে হবে। অনুশীলনের সময় খেয়াল রাখতে হবে, যেন কোমর থেকে শরীরের ওপর ভাগ বাঁ হাত দিয়ে আঘাত করার সময় ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রি এবং ডান হাত দিয়ে আঘাত করার সময় বাঁ দিকে ৪৫ ডিগ্রি ঘুরে থাকে।

ফোটো : উৎপল সরকার

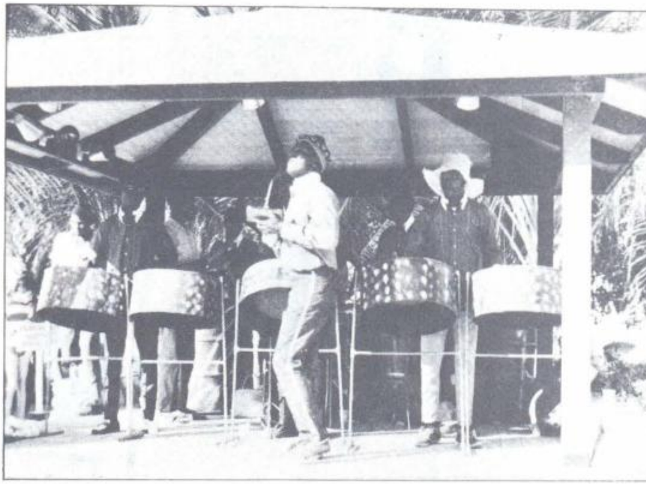

ক্যালিপ্সো সঙ্গীত

ক্যালিপ্সো সঙ্গীত সারা বিশ্বে জনপ্রিয়। আলোচনা করা হল সেই সঙ্গীতেরই ইতিহাস।

পূর্ব দিকের বদলে পশ্চিম দিক দিয়ে যাত্রা করে অভিযাত্রী ক্রিস্টোফার কলম্বাস ভারতবর্ষে আসার এক নতুন পথ আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। কলম্বাস ভারতবর্ষে পৌঁছতে পারেননি, কিন্তু ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে কিছু অনাবিষ্কৃত দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছেছিলেন, তাদের নাম রেখেছিলেন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। উর্বর মৃত্তিকা ও ঘন সবুজ উদ্ভিদে এই দ্বীপপুঞ্জ পরিপূর্ণ ছিল। দুটি শর্তই চাষের পক্ষে রীতিমত আদর্শ, এখানে প্রচুর পরিমাণে কলা ও আখ উৎপন্ন করা যায়। বড় বড় কৃষকরা সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে বিশাল আবাদ গড়ে তুলল ও সেখানে কাজ করার জন্য আফ্রিকা থেকে হাজার হাজার ক্রীতদাস আমদানি করল। এইসব ক্রীতদাস তাদের সঙ্গে নিয়ে এল আফ্রিকার সঙ্গীত, আফ্রিকার গল্প। এইভাবেই শুরু হল পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গীত। প্রথম দিকে এই সঙ্গীত ছিল পুরোপুরি আফ্রিকান, কিন্তু কালক্রমে এই সঙ্গীত তার উৎস থেকে পৃথক হতে শুরু করল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ক্রীতদাসরা যখন মুক্তি পায়, তখন এই সঙ্গীত সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব সুর ও ছন্দ আয়ত্ত করে ফেলেছে।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অনেক লোকসঙ্গীতই ক্রীতদাস প্রথার সময় থেকে চলে আসছে। জামাইকার বিখ্যাত লোকসঙ্গীত 'ডে ওহো, ডে ওহো' প্রথম শুরু করেছিলেন মহিলা ক্রীতদাসরা। এই গানটি গাইতে গাইতে তাঁরা অপেক্ষমাণ জাহাজে কলার বোঝা তুলে দিতেন। 'হিল অ্যান্ড গালি' গানটিও প্রথম শুরু করেছিলেন পুরুষ ক্রীতদাসেরা। এই গানটা গাইতে গাইতে তাঁরা আবাদে জল নিয়ে আসার জন্য খাল কাটতেন। এই গানের তালে তালে সুন্দরভাবে এগিয়ে চলত তাঁদের হাতের গাঁইতি।

ত্রিনিদাদের এক বিখ্যাত জনপ্রিয় সঙ্গীত হল 'ক্যালিপ্সো'। ক্যালিপ্সো' প্রথম শুরু হয়েছিল প্রতিবাদী সঙ্গীত হিসেবে, এই গানের প্রতি ছত্রে বড় বড় আখের আবাদে দাস-শ্রমিকদের মর্মন্তুদ জীবনকথা বিবৃত। ক্যালিপ্সো এখন কার্নিভালের প্রধান সঙ্গীত। কার্নিভাল হল লেন্ট পরবের আগে তিরিশ দিন ব্যাপী সঙ্গীত, শোভাযাত্রা আর অফুরন্ত খাওয়া-দাওয়ার এক বর্ণাঢ্য উৎসব। এই উৎসব সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হয়। অনেক ক্যালিপ্সোতে আবার মজার মজার শব্দ থাকে, সেই শব্দের তালে তালে যারা ক্যালিপ্সোর বাজনা বাজায়, তাদের বলে স্টিল ব্যাণ্ড। মজার ছন্দ আর বাজনার তালে তালে স্টিল ব্যাণ্ডরা আজ সারা পৃথিবীতে ক্যালিপ্সোর মূর্ছনা ছড়িয়ে দিয়েছেন। ত্রিনিদাদের রাজধানী পোর্ট অব স্পেন-এ যে সমস্ত স্টিল ব্যাণ্ড ক্যালিপ্সো গাইতে গাইতে রাস্তায় নাচেন, তাঁদের দলে প্রায় এক হাজার বাদক থাকেন।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, আফ্রিকার বহু দিক থেকে, বহু অংশ থেকে ক্রীতদাস আনা হয়েছিল। সেইসব ক্রীতদাসদের দৌলতে, বহু ধর্মই সেখানে ভিড় করেছিল। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব সঙ্গীত ছিল, পৃথক শব্দ ছিল। কিছু শব্দ পরে নতুন এক পৃথক পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিল। এদের মধ্যে বিখ্যাত হল 'রেগি' সঙ্গীত। রেগি প্রথমে ছিল বিশেষ একটি ধর্মের, বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গীত। এখন এটি পপ সঙ্গীতের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয়।

১৯৪০ সাল থেকে স্টিল ব্যাণ্ডরা প্রথম ত্রিনিদাদে জনপ্রিয় হতে শুরু করে। আস্তে-আস্তে তারা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপেও ছড়িয়ে পড়ে, এখন তো পৃথিবীর বহু দেশেই তারা জনপ্রিয়। তারা পপ, ধ্রুপদী ও নাচের সঙ্গীত বাজায়, ক্যালিপ্সো তো বটেই।

বিভিন্ন সুর বাজানোর জন্য স্টিল ব্যাণ্ডরা বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন রকম ড্রাম বাজান। প্রথম দিকে ড্রামগুলি ছিল এলোমেলোভাবে তৈরি। ইস্পাতের তেলের ড্রামের ওপরটা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হত। সম্ভবত এই তেলের ড্রামগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সেনারা ফেলে গিয়েছিল কিংবা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের খনিজ তৈলশিল্প থেকে জোগাড় করা হয়েছিল। আজকাল ড্রামকে 'প্যান' বলা হয়, এগুলি তৈরি করার জন্য বিশেষ এক শ্রেণীর কারিগর থাকেন।

প্যান-এর আকৃতি মূলত তিন রকম। সবচেয়ে ছোট প্যান-এর নাম 'পিংপং', এতে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ স্বন বাজানো হয়। ব্যাণ্ডের দলটিতে পিংপং দিয়ে গানের সুর বাজানো হয়। মাঝখানের ড্রামটির নাম 'দ্বিতীয় প্যান' বা 'গিটার প্যান'। এর স্বন পিংপং-এর চেয়ে নিচুতে, এতে সুরের সঙ্গত করা হয়। সবচেয়ে নিচু স্বন বাজানো হয় 'থেলো প্যান' বা 'বাস প্যান'-এর সাহায্যে। সুরের ছন্দে তাল আনার জন্য রয়েছে কিম্বল, গাইরো ইত্যাদি আরও অনেক কিছু।

প্রশ্ন

(১) পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে—এ-কথা প্রথম কে বলেন ? **গৌতম পুরকায়স্থ**, কলকাতা ১২ ।
(২) সেনেগালের রাজধানীর নাম কী ? **অর্ণব ব্যানার্জি**, সাঁওতালডি ।
(৩) বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথম কে হ্যাটট্রিক করেন ? **অয়ন চক্রবর্তী**, সালকিয়া, হাওড়া ।
(৪) সৈয়দ আউইতা লস অ্যাঞ্জেলিসে ৫০০০ মিটারে সোনা জেতার পর তাঁর দেশের রাজা একটি ট্রেনের নাম কী রেখেছিলেন ? **সুব্রত নাগ**, রায়গঞ্জ ।
(৫) আফ্রিকার মাত্র একটি শহরে পাতালরেল আছে । কোথায় ? **শেখ আবদুর রব**, বর্ধমান ।
(৬) D. M. K-র পুরো নাম কী ? **রাজীব দেব**, শিজুবিহার স্কুল, আগরতলা ।
(৭) 'অ্যাসবেসটর' একটি গ্রিক শব্দ, এর অর্থ কী ? **পর্ণব বসু রায়**, বাগবাজার ।
(৮) ভারতের বর্তমান অর্থমন্ত্রীর নাম কী ? **অর্কজ্যোতি বিশ্বাস**, বেলঘরিয়া ।
(৯) আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল শহর কোনটি ? **তানিয়া দাশগুপ্ত**, শ্যামবাজার ।
(১০) T. U. L. F-এর পুরো নাম কী ? **সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়**, শোভাবাজার ।
(১১) মাইক টাইসনের জীবনীর নাম কী ? **কমল সিওয়া**, হ্যামিল্টনগঞ্জ।
(১২) টেস্ট ক্রিকেটে সুনীল গাওস্কর কার বিরুদ্ধে প্রথম শতরান করেন ? **শ্যামলকুমার দাস**, বিবেকানন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জামশেদপুর ।
(১৩) ইংল্যাণ্ডের ডিকি বার্ড বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি আম্পায়ারিং করেছেন । ডিকি বার্ডের পরে কার স্থান ? **রাজীব হাজরা**, বর্ধমান ।
(১৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর কার্যালয়কে কেন 'পেন্টাগন' বলা হয় ? **তরুণকুমার সাহা**, কোচবিহার ।

নিল ও'ব্রায়েন

(১৫) কোন খেলোয়াড়কে বলা হত 'চিনের প্রাচীর' ? **প্রশান্ত পাল**, নদীয়া ।
(১৬) 'If I am assasinated' কার লেখা ? **শিবাজি রায়**, বর্ধমান ।
(১৭) গ্রিক সূর্য-দেবতার নাম কী ? **সৌমেন বসু**, মেমারি, বর্ধমান ।
(১৮) ১৯৯০-এর বিশ্বকাপ ফুটবলের ম্যাসকটের নাম কী ? **আদিত্য রায়**, কলকাতা-৪৫ ।
(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) চিন ।
(২) এঁদের কেউই স্কুলের গণ্ডি পার হননি ।
(৩) ডান-হাতি ব্যাটসম্যানের কাছে বাঁ-হাতি স্পিনারের অফ ব্রেক ।
(৪) মজলিশ ।
(৫) ঢেকা ।
(৬) ইংল্যান্ডের শেফিল্ড ফুটবল ক্লাব ।
(৭) রুবল
(৮) ইহুদিদের টুপি ।
(৯) তেনজিং নোরগে ।
(১০) ভিনিগার রার্সিকার ।
(১১) রুপা গাঙ্গুলি
(১২) হায়দরাবাদ ।
(১৩) সহদেব ।
(১৪) বার্সিলোনা-১৯৭১ ।
(১৫) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ।
(১৬) বাইবেল ।
(১৭) ইরানের সংবাদসংস্থা ।
(১৮) বিচিত্রা ।
(১৯) ডঃ সফিউদ্দিন কিচলু ।
(২০) সৈয়দ আউইতা ।
(২১) মোগাডিসু ।

টমাস আলভা এডিসন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তেনজিং নোরগে

চার্লি চ্যাপলিন

বিষয় : অস্ট্রেলিয়া

(খ)

(ক)

(গ)

কিসের ছবি

(ক) পাহাড়টি কী নামে পরিচিত ?
(খ) সেতুটির নাম কী ?
(গ) বিখ্যাত এক ক্রিকেট-মাঠ । নাম কী ?

ছবির পরিচয় : (ক) সিডনি হারবার ব্রিজ । (খ) আয়ার'স রক । (গ) মেলবোর্ন ক্রিকেট-মাঠ ।

প্রশ্ন :

(১) 'অস্ট্রেলিয়া' শব্দের অর্থ কী ?
(২) অস্ট্রেলিয়ার কোন অংশকে 'ভ্যান দাইমেনের দেশ' বলা হয় ?
(৩) অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সঙ্গীত কী ?
(৪) ২৫ এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ানরা আনজাক দিবস পালন করে । এই দিনটি পালন করার কারণ কী ?
(৫) অস্ট্রেলিয়ার কোন্ রাজ্যকে বলা হয় 'কলার রাজ্য ?'
(৬) অস্ট্রেলিয়ার পশম-শিল্প কোন্ প্রজাতির ভেড়ার ওপর নির্ভরশীল ?
(৭) কোন ইংরেজ ১৭৭০ সালের ২০ এপ্রিল বটানি উপসাগরে নেমেছিলেন এবং সেই দ্বীপের নাম রেখেছিলেন 'নিউ সাউথ ওয়েলস ?'
(৮) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারজয়ী একমাত্র অস্ট্রেলিয়ান ব্যক্তিটির নাম কী ?
(৯) 'অস্ট্রেলীয় নিয়মাবলী ' কী ?
(১০) বার্ক-উইলিস অভিযানে রবার্ট বার্ক ও উইলিয়াম উইলিস কী কৃতিত্ব স্থাপন করেছিলেন ?
(১১) ক্রিকেট খেলায় 'একস্ট্রা' শব্দটিকে অস্ট্রেলীয় ভাষায় কী বলা হয় ?
(১২) কোন অস্ট্রেলীয় টেনিস-তারকা 'রকেট' নামে পরিচিত ?
(১৩) 'উইলি-উইলি' কী ?
(১৪) অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা-কেন্দ্রটির নাম কী ?
(১৫) অস্ট্রেলীয়রা কাকে 'কোবার' বলে ডাকে ?
(১৬) অস্ট্রেলিয়ার জীবজগৎ খুব বিচিত্র । পৃথিবীতে ডিম পাড়ে এরকম দুটি স্তন্যপায়ী প্রাণীকে এখানে দেখতে পাওয়া যায় । এদের নাম কী ?
(১৭) ১৯০১ সাল থেকে ১৯২৭ সাল অবধি অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী কী ছিল ?
(১৮) কোন্ অস্ট্রেলিয়ান গায়িকার নামে একটি আইসক্রিমের নাম দেওয়া হয়েছে ?
(১৯) ১৮৫১ সাল থেকে খেলাধুলোর একটি বিভাগে, ট্রোফি জয় করে আমেরিকা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ১৯৮০ সালে অস্ট্রেলিয়ানরা সেই খেলায় নামে ও আমেরিকানদের আধিপত্য ভেঙে দেয় । কোন্ খেলা ?
(২০) 'স্ট্রাইন' কী ?

উত্তর : (১) দক্ষিণের দেশ । (২) টাসমানিয়া । (৩) অ্যাডভান্স অস্ট্রেলিয়া ফেয়ার । (৪) দুটি বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যু । 'আনজাক' শব্দের সম্পূর্ণ মানে হল, অস্ট্রেলিয়ান অ্যাণ্ড নিউজিল্যাণ্ড আর্মি কোর । (৫) কুইন্সল্যাণ্ড । (৬) মেরিনো । (৭) ক্যাপ্টেন জেমস কুক । (৮) প্যাট্রিক হোয়াইট । (৯) অস্ট্রেলিয়ার বিশেষ ধরনের ফুটবল খেলা । (১০) তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিক অবধি দৌড়েছিলেন, কিন্তু ফেরার পথে অনাহারে তাঁদের মৃত্যু হয় । (১১) সানড্রিজ । (১২) রড লেভার । (১৩) সাইক্লোন, 'আঁধি' বা ধুলোর ঝড় । (১৪) উমেরা । (১৫) বন্ধুকে । (১৬) প্লাটিপাস এবং একিডনা । (১৭) মেলবোর্ন । বর্তমান রাজধানী হল ক্যানবেরা । (১৮) দামে নেলি মেলবা—পিচ মেলবা । (১৯) আমেরিকার ইয়াটিং প্রতিযোগিতার কাপ । (২০) অস্ট্রেলীয় ভাষার হাস্যকর রূপান্তর । অশিক্ষিত অস্ট্রেলীয়রা এই জাতীয় ইংরেজি বলে । যেমন, এম্মা চেজিট । মানে হল, হাউ মাচ ইজ ইট ?

বাইরের জানালা

গৌতম চক্রবর্তী

পিয়ারি কি প্রতারক

রবার্ট এডউইন পিয়ারি কি সত্যিই উত্তর মেরুতে পৌঁছেছিলেন ? পিয়ারি কি উত্তরমেরুর সফল অভিযাত্রী ? নাকি, তিনি একজন প্রতারক ?
আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই প্রশ্ন নিয়ে জমে উঠেছে জোর লড়াই । তর্কটা প্রথম শুরু করেছিলেন বাল্টিমোরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডেনিস রলিন্স । নরওয়ের জাতীয় মহাফেজখানায় এখনও সংরক্ষিত আছে পিয়ারির উত্তরমেরুতে জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার কাগজপত্র ।

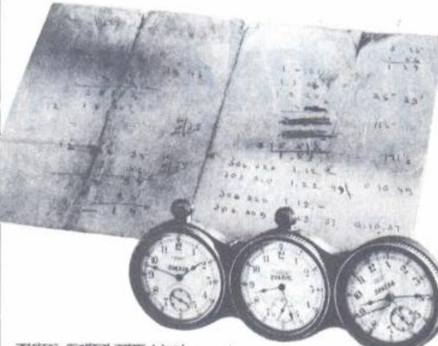

কাগজে দেখানো আছে ১৯০৯ সালের ৭ এপ্রিলে সূর্যের অবস্থান । অঙ্ক কষে রলিন্স প্রমাণ করলেন, ওইদিন সূর্যের ওরকম অবস্থান হতে পারে উত্তরমেরু থেকে ১২১ মাইল দূরে !
কম্পাসের সংখ্যাগুলি প্রমাণ করছে, পিয়ারি যে রাস্তায় গেছেন বলে দাবি করেছেন, তিনি আদৌ সেই রাস্তায় যাননি । উত্তরমেরুর পথ থেকে তিনি ডান দিকে সরে গিয়েছিলেন । রলিন্স সংবাদপত্রের শিরোনামে ঘোষণা করে দিলেন, 'পিয়ারি এই শতকের শ্রেষ্ঠতম প্রতারক ।'
দ্বিতীয় বোমাটি ফাটিয়েছেন অন্য আর-এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী টমাস ডেভিস । তিনি বলেছেন, রলিন্স-এর অঙ্কটাই ভুল । ওই পাতায় সূর্যের অবস্থান দেখানো হয়নি, দেখানো হয়েছে 'বেতেলগিউজ' নামের একটি নক্ষত্রের অবস্থান । রলিন্স যে সংখ্যাগুলিকে কম্পাসের সংখ্যা বলে মনে করছেন, সেগুলি কম্পাসের সংখ্যা নয়, ক্রোনোমিটারের সংখ্যা । এবং ডেভিসের অঙ্ক অনুযায়ী, পিয়ারি উত্তরমেরু থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে বসে এই নক্ষত্র-পর্যবেক্ষণ করেছিলেন ।
কোনও অঙ্কই অবশ্য সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারেনি, পিয়ারি সত্যিই উত্তরমেরুতে পৌঁছেছিলেন কি না ?

নেমোরিয়া-রহস্য

শুঁয়োপোকাটা বড় হয়ে কীরকম দেখতে হবে ? ফুলের মতো, নাকি শুকনো ওক গাছের শাখার মতো ? কিন্তু একই পোকা তো কখনও দু'রকম হতে পারে না ! পারে ! 'নেমোরিয়া আরিজোনারিয়া' নামের পোকারা দু'রকমই দেখতে হতে পারে । এই পোকারা দক্ষিণ-পশ্চিম

আমেরিকা ও মেক্সিকো-র ওক গাছে থাকে । এই পোকাদের ডিম ফুটে বছরে দু'বার শূককীট বা শুঁয়োপোকা বার হয় । প্রথমে বসন্তকালে, দ্বিতীয়বার গ্রীষ্মকালে ! বসন্তকালে যখন নেমোরিয়ার ডিম ফোটে, তখন ওক গাছগুলি কাঁটাওয়ালা হলুদ ক্যাটকিন ফুলে ঢাকা । এইসব শুঁয়োপোকা বড় হয়ে অবিকল ক্যাটকিন ফুলের মতো দেখতে হয় ।
দ্বিতীয়বার ডিম ফুটে শুঁয়োপোকা বার হয় গ্রীষ্মকালে । ওক গাছ থেকে তখন ক্যাটকিন ফুল বিদায় নিয়েছে । এই শুঁয়োপোকারা বড় হয়ে ওক গাছের শাখার মতো দেখতে হয় ।
অত্যাশ্চর্য এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী এরিখ গ্রিন । জাদুকর হুডিনির মতোই তিনি বলেছেন, "আমাকে যে-কোনও একটা ডিম দিন । এবার বলুন, কী ধরনের পোকা আপনার দরকার । ক্যাটকিন ফুলের মতো ? তাই দেব । ওক গাছের শাখার মতো ? তাই দেব ।"
হ্যাঁ, এরিখ গবেষণা করে নেমোরিয়া-রহস্য জেনে ফেলেছেন । শুঁয়োপোকারা কী খাচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে তারা বড় হয়ে কীরকম দেখতে হবে । প্রথম দল ক্যাটকিন ফুল খায়, তাই ক্যাটকিন ফুলের মতো দেখতে । দ্বিতীয় দল শুকনো ওকপাতা খায়, তাই ওকশাখার মতো দেখতে ! 'ক্যামোফ্লেজ'-এর পিছনেও যে এরকম 'ফুড-ভ্যালু' আছে, কে জানত ?

বাজপাখিদের ভয়ে

পাখিরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে । ওরা কাকে ভয় পাচ্ছে ? একজন মানুষকে । শ্মশ্রু, গুম্ফসমন্বিত এই মানুষটির নাম ডোমিনিক ডি কার্লো ! কার্লোর পেশা হল বাজপাখি পোষা । বাজপাখিদের ট্রেনিং দিয়ে শিক্ষিত করা ! কার্লোর বাজপাখি বোঝাই হাজির হচ্ছেন তাঁর ভ্যানগাড়ি নিয়ে । পোষা বাজপাখি তাড়া করে সেই পাখিদের বিমানবন্দরের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে । পাখির ডানার সঙ্গে বিমানের ধাক্কা লেগে অনেক সময় দুর্ঘটনায় পড়ে যায় বিমান । সেই দুর্ঘটনা এড়াতেই লেস্টার পিয়ার্সন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এই অভিনব চেষ্টা ! এর আগে টেপ-রেকর্ডারে পাখিদের কান্না শুনিয়ে রানওয়েতে

ভ্যানগাড়ি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই টরন্টোর লেস্টার বি পিয়ার্সন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পাখিরা ভয় পেয়ে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে । বিমানবন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে কার্লোর অষ্টপ্রহরব্যাপী বেতার-সংযোগ রয়েছে । বিমানবন্দরে কোথাও পাখি দেখা গেলেই দশ মিনিটের মধ্যে কার্লো

পাখিদের ঢুকতে দেওয়া হত না । তবু পুরোপুরি সফল হয়নি এই পদ্ধতি, কিন্তু কার্লোর এই চেষ্টা সেই আগের পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর হয়েছে ।
এই সংরক্ষণের যুগে পাখি শিকারের চেয়ে যে কার্লোর বাজপাখি-ট্রেনিং ঢের বেশি বিজ্ঞানসম্মত, সন্দেহ কী ?

সম্পূর্ণ উপন্যাস

সাধুচরণের বাগাল

শিবতোষ ঘোষ

পিন্টা-মিন্টা দু' ভাই, মা মারা যাওয়ার পর বাবা একা খেটে আর প্রতিপালন করতে পারলেন না, দু' ভাইকেই বাগাল রেখে দিলেন। বাবা বললেন, "বাপ-খুড়ো কি আলাদা নাকি, এখানে থাকাও যা ওখানে থাকাও তা, ওরে তোদের খুড়ো রে, পাঁচগেড়্যার সাধুখুড়ো।" এই সাধুখুড়োর মা ঠাকমা-বুড়ি, বড় খিটখিটে বুড়ি। যেদিন খুড়োর সঙ্গে এল, পিন্টা-মিন্টা জানে ওদের বাড়িতে লালিত হতে আসছে, একজনের সুখের সংসার ভেঙে গেলে তো কেউ-না-কেউ তার সুখের কণা দেয়, কিন্তু দুয়োরে পা দিতে-না-দিতে ঠাকমা-বুড়ি কীরকম এক অবিস্মরণীয় মুখ মেচ্‌কে-মেচ্‌কে এসে বলল, "ও সাধু, এ যে ডিমের খোলস ভাঙেনি রে অ্যাঁ, আবার একটা নয় দুটো, এ তুই কী বাগাল আনলি রে!" পিন্টা-মিন্টা সেদিনই জেনে গিয়েছিল বাবা তাদের বানিয়ে বলেছেন, তারা বাগাল খাটতে এসেছে।

পর দিন ভাল করে ভোর হতেও তর সইল না। ঠাকমা-বুড়ি ঝুজ্‌কা থাকতে-থাকতেই উঠে পড়ে, বয়স-শরীরকে তো বিশ্রাম দেওয়ার দরকার হয় না, ও এমনিতেই শীতল। "নে-নে উঠ-উঠ!" এমন তাড়া দিয়ে ডাকা যেন কোথাও ঘরে আগুন লেগেছে। "কত বেলা হয়ে গেল, এরকম কালঘুম নাকি রে তোদের, অ্যাঁ?"

পিন্টা-মিন্টা দু'জনেই স্বপ্ন দেখছিল, ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। কিন্তু দু'জনেই ঘুমচোখ রগড়াতে-রগড়াতে মনে-মনে প্রার্থনা করল—হে ভগবান, স্বপ্নটা যেন সত্যি না হয়। স্বপ্নের গল্পটা কারও মনে নেই, কিন্তু তারা যে ঘুমে-ঘুমে হুহু করে বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠেছিল এটা দু'জনেরই মনে পড়ছে।

ঠাকমা-বুড়ি পিন্টার হাতে গোয়ালের চাবি দিয়ে বলল, "নে, অত ঢং করে চোখ ঘষতে হবেনি, গোয়াল কাদা করে দিচ্ছে ওদিকে, আর এরা রাজার নাতির মতো আলিস ভাঙছে।"

গোয়ালের দিকে যেতে-যেতে ভোরের দিকে তাকাল পিন্টা-মিন্টা। একই রকমের ফাঁকা হয়ে আসা অথচ কত তফাত।

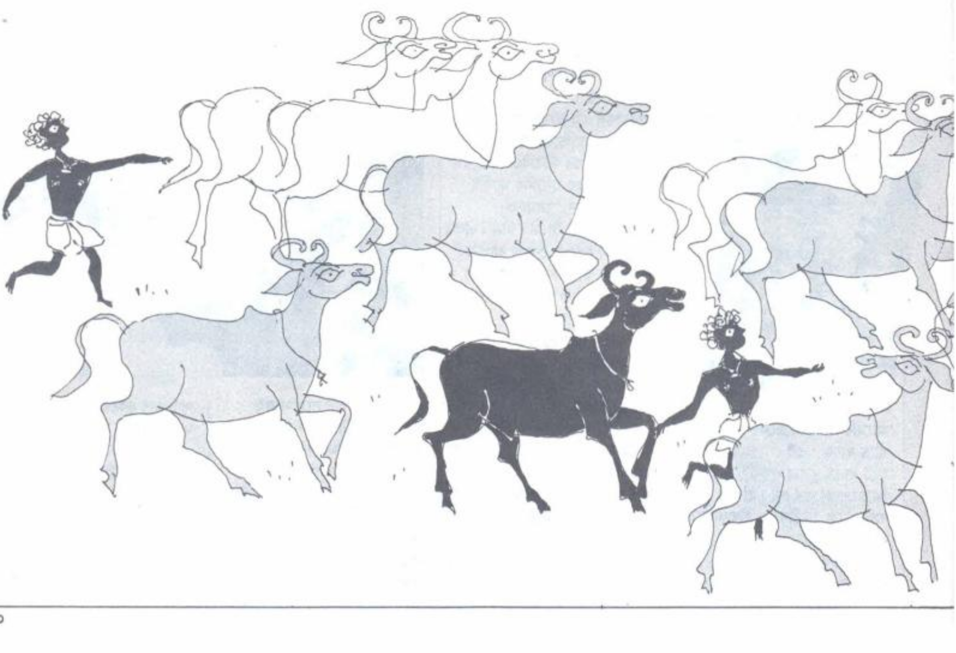

ওদের বাগাল জীবন শুরু হল। পিন্টা-মিন্টার একটাই সান্ত্বনা, গোয়ালের চাবিটা খুব ঝকঝকে ও মসৃণ। গালে চাবি রেখে, বুলিয়ে পিন্টা মিন্টাকে দেয়, মিন্টাও সান্ত্বনা সংগ্রহ করে, গালে রাখে।

গোয়াল খুলে দেখেই পিন্টা-মিন্টা ঘাবড়ে যায়, এ যে এক-গোয়াল গোরু! সতেরোটা গোরু সব মিলিয়ে। জঙ্গল দেশে ফসল-আনাজপাতি খুব কম হয়, গোরু-ছাগলই মূল রোজগার। এত গোরু বাগালি করতে হবে, সঙ্গে দুর্জয়-দুর্জয় গোরুও আছে তিন-চারটা।

ছোটগুলো বের করতে লাগল মিন্টা, ন' বছর বয়স। কিন্তু পিন্টাও কালো হেলেটার কাছে যেতেই সে বাঁ পা দিয়ে গোয়ালের মাটি খুঁড়ে এমন হাঁউক-হাঁউক গর্জন করতে লাগল! যেখানটায় মাটি খুঁড়ছে মনে হচ্ছে আর কিছুক্ষণ খুঁড়লে ওই জায়গাটায় একটা হ্রদ তৈরি করে ফেলবে। বারো বছরের পিন্টার আর কত সাহস হবে। ওপাশে মিন্টা তখন চেঁচিয়ে উঠেছে, "দাদা, পারবিনি, মেরে ফেলবে, পালিয়ে আয়!"

ঠাকমা-বুড়ি রেগে বলল, "উঁ, মেরে ফেলবে না খেয়ে ফেলবে, রাজার নাতি সব, গোরু বের করতে পারবিনি তো বাগাল থাকতে আসছু কেনে, ঘর চলে যা! কাল রাতেই তো দেখেছি খাউনি তো কম নয়।"

খাউনি! পিন্টা তো আর দ্বিতীয়বার ভাত নেয়নি, লজ্জায় না কী যে হল....তা হলে কি মিন্টা, ও দু'বার ভাত নিয়েছিল না তিনবার?

পিন্টা সাহস করে এগিয়ে গিয়ে গায়ে হাত বুলোতে শুরু করল কালো হেলের, দেখাদেখি মিন্টাও এগিয়ে যায়। বাঁধা গোরু দড়ি না ছিড়লে বা খুঁটি না উপড়ালে কিছু করতে পারবে না। দু'জনে দু'দিকে আদরে ডলতে থাকে কালো হেলের পিঠ। বাবা শিবের ষাঁড়, না ষাঁড়

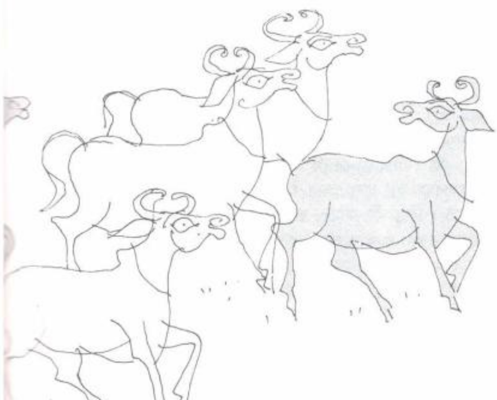

নয়, হেলে, হেলে আবার বাবার হয় কী করে, তবু উপায় না দেখে পিন্টা-মিন্টা শিবকেই ভক্তিভরে ডাকতে থাকে, "বাবা, এই মারকা-হেলেটাকে শান্ত করে দাও, আমাদের আশ্রয়টা যেন ভেঙে না যায়।" বাবার দয়াতেই বোধহয় হেলেটা মাটি খোঁড়া বন্ধ করল, অবশ্য এই সময় সাধুচরণ উঠে আসে এবং মারকা-হেলেকে কীভাবে বের করতে হবে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দেয়।

দু-চার দিনের মধ্যেই এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ কালো হেলেকে সম্পূর্ণ বশ করে ফেলল পিন্টা-মিন্টা। ভালবাসায় কী না হয়। পাতা খাইয়ে, আলাদাভাবে ছিড়ে-ছিড়ে ঘাস খাইয়ে, গায়ে-গলায় হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই এমন হয়ে গেল যে, ওদেরকে শিং-ফোঁপানো তো দূরের কথা, ওদের কাউকে দেখতে না পেলেই বরং হামলায়। সাধুচরণের বাগাল পিন্টা-মিন্টা এত ছোট হয়েও বুঝে যায় ভালবাসার কোনও বিকল্প নেই।

মিন্টা বাঁশি বাজাতে পারে, তার বাবা আসার সময় তাঁর বাঁশিটাই দিয়ে দিলেন, সাত ফুটোর বাঁশের বাঁশি, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এর চেয়ে বেশি কিছু দেওয়ার ছিল না তার বাবার। পিন্টা গান গায়। মিন্টাকে বাঁশি বাজাতে শিখিয়েছিলেন, পিন্টাকে গান গাইতে, আর আশ্চর্য, এত গরিব হয়েও একটা কোনও করুণ সুর কি দুঃখের গান জানেন না, তার বাবার সবই আনন্দের সুর, সবই সুখের গান:

জলে ডাকে পানকৌড়িটা
ডাঙায় ডাকে ঝিল্লি,
ও খোকা, তোকে এনে দেব
রাজার ঘরের বিল্লি।

জঙ্গলে আরও অনেকে যায় গোরু নিয়ে, গোরু চরাতে, এদের মধ্যে সবার চেয়ে ছোট পিন্টা-মিন্টা, আর সকলের চেয়ে বয়স্ক পুণ্যকাকা।

প্রায় প্রত্যেকেই অন্যের গোরু বাগালি করতে যেত, একমাত্র পুণ্যকাকারই নিজের গোরু। তবে তার মোটে তিনটে গোরু। একটা গাই, দুধ দেয় না, একটা বাছুর, দেখলে মনে হবে না কোনওদিন বড় হবে, আর-একটা বুড়ো হেলে, ওকে দেখলেও মনে হয় না ওর কাছে কোনও ঋণ আছে পুণ্যকাকার, এমনই হাড় জিরজিরে।

জঙ্গলের গ্রামগুলো এমনিতে খুব গরিব হয়, কিন্তু পুণ্যকাকা যেন সবচাইতে গরিব। পাথরডাঙায় দশ কাঠা খাস জমি পেয়েছে, ওরই এক কোনায় লাল মাটির হাফ-কাঁথ-দেওয়া ঘর, ডালপাতা গোঁজা চাল, বহু বছর আগে কোনও সেবামূলক সংস্থা ঝড় জাতীয় কোনও কারণে কালো ত্রিপলগুলো বিলিয়েছিল, তারই ছেঁড়া ক্ষুদ্রাংশ তখনও চালের মাথায় তাদের জয়গান গেয়ে যাচ্ছে। বাকি জমিটা এমনিই পড়ে থাকে, চাষবাস তো দূরের কুশকাশিও ফলে না। একটা মাত্র কাজুবাদামের গাছ আছে, একটা গাছে আর কত বাদাম হবে, বুড়ো গাছ, সেজন্য বিক্রি করে না যা হয় পুড়িয়ে খেয়ে নেয়।

পুণ্যকাকা জনমজুরও খাটে না, সে গুনিন, গুনিনকে লাঙলের বোঁটা ধরতে নেই, আরও কীসব করতে নেই, সেজন্য তাকে কেউ আর মজুরও ডাকে না। পুণ্যকাকার যতটুকু সংসার চলে তা ওই গুনিনের আয় থেকে। ভূতে ধরা, ডাইনি তাড়ানো, সাপে কাটা, দুধ-চালা, ছেলে-কাঁদানো, বাতাস-লাগা কত কী যে জানে পুণ্যকাকা। পিন্টা-মিন্টার কাছে কত গল্প করে, "দিনের বেলা তারা দেখবি?" দিনের বেলা তারা! হাঁ হয়ে যায় পিন্টা-মিন্টা। "একটা পাতা দেব, তার ওপরে দাঁড়াবি, সূর্যের আলো পর্যন্ত সরে যাবে আকাশ থেকে, সূর্যের আলোর জন্যই তো তারা দেখা যায় না, না হলে তারারা তো আকাশেই থাকে।" কখনও বলে, "একটা শেকড় দেব, হাতে নিয়ে সাপের গর্তে পা দিবি, সাপ মুখ পর্যন্ত বাড়াবে না।" নাকি দারুণ

ছিপ-মন্ত্রানো জানে পুণ্যকাকা, "একগাছা চুল মন্ত্রে ছিপে বেঁধে দেব, তারপর নিয়ে চলে যা, পুকুর হোক দিঘি হোক সেরা মাছটা তোর।"

শুনে-শুনে পিন্টা-মিন্টা একদিন বলেই ফেলল, "তুমি যদি এত জানো, তা হলে তোমার এরকম কেন ?"

"কীরকম ? চালে খড় নেই, ঘরে ভাত নেই, এই তো ? তা কী করব বল ? মা'র থানে তো বললেই পরদিন রোগীতে ভর্তি করে দিবে, কিন্তু আমি মানুষের খারাপ চাইতেই পারি না। মানুষ হয়ে মানুষের খারাপ চাই কী করে, তোরাই বল।"

পিন্টা-মিন্টা দ্রুত বলে উঠল, "না-না।"

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পিন্টা-মিন্টা দু' ভাইকে একসঙ্গে আর গাঙ জুড়ে সঙ সাজতে পাঠানো হল না, ঠাকমা-বুড়িই বলল, "সাধু, তুই গোরু বাগালি করতে পাঠাচ্ছু না গাঙ জুড়ে....এক কাজে দুটা বাগাল, তাও এই ক'টা গোরু, হত কাত্যায়নীদের মতো তিনকুড়ি-চারকুড়ি, তা হলে বুঝতাম।" ঠকে যাচ্ছে গৃহস্থ অতএব মিন্টাকে গোরুর সঙ্গে পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হল। পিন্টা দু' খাবল পান্তা খেয়ে গোরু খুলে নিয়ে যায়, চোর গোরুর গলায় ঢুরকা থাকে, কাঠের ঘণ্টা, কোথাও পালিয়ে গেলেও শব্দ শুনে ঘুরিয়ে আনা যায়। ঠাকমা-বুড়ি বলল, "তোকে কী আর করতে হয় রে, বাগালদের সঙ্গে তো সারাদিন খেলে বেড়াস। মিন্টা থাকলে তবু বাড়ির দু-একটা ফাই-ফরমাশ করবে, ওরও তো খাউনি কম নয়।"

মিন্টার ভার পড়ল গোয়াল নিকনো, এত গোরুর গোয়াল, ন' বছরের মিন্টা, গোবর ঝুড়ি কোমরে তুলতে কোমর বেঁকে যায়। মুড়ো নারকেল ঝাঁটা নিয়ে এমাথা-ওমাথা ঝাঁটানো, গোয়াল ছাড়া বাইরে ঝাঁটানো, আঁদাল-কাঁদাল, যখন সকালের কাজ শেষ করে ঝাঁটা, হাত-পা ধুয়ে এসে কোমর সোজা করে দাঁড়ায়, দেখে ঠাকমা-বুড়ি আবার একটা কাজ মুখে নিয়ে, বলল, "যা, যা দেখি, বউমা উনান ধরাতে পারছেনি, দুটা জ্বালন কুচিয়ে দে তো।" জ্বালন মানে রান্নার কাঠ, একটা অধার কাতান ঠেকিয়ে দিয়ে ঠাকমা-বুড়ি কাঠ-কঞ্চির চাঁড় দেখিয়ে দেয়। হায় ভগবান, একটা এক ইঞ্চি ব্যাসের কঞ্চি কাটতেই লাগছে তিন কোপ, সত্তরটা কঞ্চিও তো কম করে লাগবে একবেলার রান্নায়, সত্তর গুণিতক তিন এবং যেগুলো কঞ্চি নয় আরও কিছু মোটা, তাদের একটা কাটতেই আট-দশটা কোপ। তবে মিন্টা কোপের হিসেব রাখেনি, অত বাচ্চা ছেলের পক্ষে রাখা সম্ভবও নয়, তা ওপরওয়ালা তো সব দেখছেন, দেখছেন তো—মিন্টা ওপর দিকে তাকায়। কাঠ কেটে সে যখন ওঠে, তার শরীর অবশ, ক্লান্ত, প্রচণ্ড দুর্যোগ-ঝড়ে একটা হালকা আধমরা বাঁশপাতার অবস্থা যেমন হয় কিংবা একটা মুরগি বাচ্চাকে তিনটে শক্ত আছাড় মেরে যেন তার ঠ্যাং ধরে নাড়াচ্ছে কেউ।

পিন্টা-মিন্টা সারাদিনের কাজ সেরে সন্ধেবেলা পুকুরের জলে ডুবে-ডুবেও কিছুতেই শান্ত হতে পারে না, ওদের শরীরে যে জল লাগছে যেন বাষ্প হয়ে যাচ্ছে সব জল। পুকুরের জল, চোখের জল লবণাক্ত হয়ে সব যখন একাকার হয়ে যায় তখন পিন্টা-মিন্টার মনে পড়ল, কে যেন বলেছিল, যার মা নেই তার রা নেই। রাতে শুয়ে মিন্টা পিন্টাকে জিজ্ঞেস করছে, "হ্যাঁ রে দাদা, রা মানে কী ?"

পিন্টা বুঝতে না পেরে বলল, "কী রা ?"

মিন্টা বলল, "সেই যে, মা মারা যাবার সময় রাজুজ্যাঠার মা কান্তিদিদি বলেছিল, "যার মা নেই তার রা নেই।"

দু'জনেই চুপ করে যায়। অন্ধকারে পিন্টা-মিন্টা 'রা' মানে খুঁজতে থাকে না কাঁদতে থাকে বোঝা যায় না।

এই রকম গোরুর সব কাজ করে পিন্টা, বাড়ির সব কাজ করে মিন্টা। আধপো দুধ কমলেও পিন্টা, ঠাকমা-বুড়ির গাল, সাধুচরণের গেঁটে-হাতের থাপ্পড়, বাবা এলে বাবাকে বলবে, "বাবা, এ-বাড়ির সব ভাল, শুধু সাধুখুড়োর হাতগুলো ভীষণ শক্ত, মারলে ভীষণ লাগে।" গোরুর পেট ফেঁপেছে, পিন্টা, লাঙল টানতে-টানতে কোনও হেলে কুঁড়েমি করে শুয়ে পড়েছে তখনও....না, তখন চড়-চাপড় নয়, সাধুচরণের হাল-ডাং, নিশ্চয় গোরুকে খেতে দিচ্ছে না। মার খাওয়ার সময় গোরু আর পিন্টা খুব কাছাকাছি এসে যায়, গোরুর বোবা কান্নাতে সেও আজকাল রীতিমত পারুকদার হয়ে উঠেছে।

মিন্টার প্রথম দিন শুরু হয় ছাই ফেলা দিয়ে, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, সত্যি-সত্যি একটা ভাঙা কুলোই তাকে দেওয়া হয়েছে ছাই ফেলার জন্য, আর যদি কোনও কারণে ওই ভাঙা দিয়ে এক চামচও

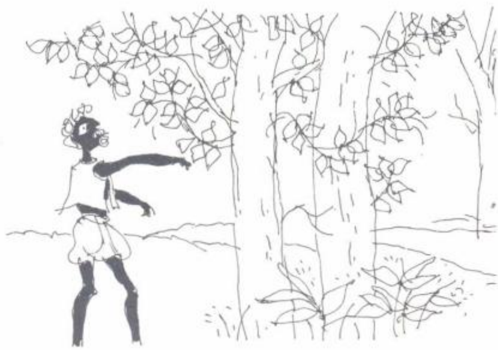

ছাইপাঁশ গলে পড়ে যায়....ঠাকমা-বুড়ি হায়-হায় করে ওঠে, সর্বনাশ হয়ে গেল, ছাই পড়লে নাকি গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।

ঠাকমা-বুড়ি তার দশ হাত বেধবা-কাপড়ে সাবান দেওয়ায়, বেশি সাবান খরচ করা চলবে না অথচ বেশি সাফা করা চাই, তুলে আছড়ানো চলবে না বয়স্ক-কাপড় ফেঁসে যাবে, রে-রে করে ওঠে ঠাকমা-বুড়ি। এমন রে-রে যে, মাইনে পেলে কেটে নিত। মোলায়েম করে থোবাতে হয়, হৃদয় থেকে যত্ন বের করে উজাড় করে দিতে হয় দু' হাতে। কিন্তু কী করবে, ভাল করে তুলতেই পারে না মিন্টা, কনট্রোলের কম দামি কাপড়, মোটা তো মোটা, জল খেয়ে পাথরের মতো ভার হয়ে ওঠে ঠাকমা-বুড়ির কাপড়। আর কোনও একটু সময় একটু কাজ হাতছাড়া হতে দেখলেই....মিন্টা কতদিন বাঁশি বাজায়নি, গোয়ালের পেছনে বসে বাঁশিতে যেই ফুঁ-টুকু দিয়েছে, ঠাকমা-বুড়ি চেঁচাতে-চেঁচাতে হাজির, "ও সাধু, এ যে যশোদার বেটাকে আনছু রে তুই, এ যে দেখি কিষ্টা-ছোঁড়া, বাঁশি বাজায় ! আয়, এদিকে আয় বলছি !" ঠাকমা-বুড়ি পিঠ খুলে বসে, বলে, "নে, ঘামাচি মার, শুধু বসে বসে খাবি !" মিন্টা দেখে শিউরে উঠে, উঃ কী কুৎসিত খসখসে পিঠ। মানুষের গা এত কুৎসিতও হয়, হাত দিতে ইচ্ছে করে না, কিছুতেই করে না। পচা টোকাপানায় যেমন পুকুরের জল দেখা যায় না, তেমনই ঘামাচির চাগড়ায় পিঠও দেখা যায় না ঠাকমা-বুড়ির। কিন্তু কী করবে, ওতেই সযতনে কুরকুর করে। দুপুরবেলা পিঠের আমেজে ঢুলুনি লাগছে ঠাকমা-বুড়ির, মিন্টারও কোনও একটা সময় দৈবাৎ চোখে ঢুল এসে গেলে, সামান্য সময় হাত একটু থেমে গেলেই কী করে ঠাকমা-বুড়ি টের পেয়ে যায়, সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত কায়দায়

ঠোনা দেয় গালে, ঠোনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোনও শব্দ হয় না কিন্তু যন্ত্রণাটা হয়।

এরকম অবস্থায় আবার একদিন এক অঘটন ঘটল, একটা বাছুর দড়ি ছিঁড়ে খুব সুন্দর একটা বাড়ন্ত কাঁঠাল-চারা খেয়ে ফেলল। কেউ বিশ্বাস করবে না যে দোষটা পিন্টা-মিন্টার নয়, বাছুরের দড়ি পুরনো হয়ে গিয়েছিল, পচে গিয়েছিল, আর বাছুরটাও পিন্টার আদর-যত্ন পেয়ে-পেয়ে হয়ে উঠেছিল টাট্টু ঘোড়ার মতো। পিন্টা বলেওছিল, ওর দড়াদড়ি, মুখোর—এসব বদলাতে হবে, ও আজকাল ভীষণ দুষ্টু হয়ে উঠেছে। পিন্টা বাছুরের একটা নামও দিয়েছে, লালমোহন, বাছুরটা ছিল লাল।

প্রথমে পিন্টাকে কিছু বলেনি সাধুখুড়ো, দৌড়ে গিয়ে বেড়ার গা

থেকে একটা ডাং-মতন লাঠি ভেঙে নিয়ে এসে এমন বেদিশা মারতে শুরু করে দিল বাছুরটাকে, ঠাকমা-বুড়ি চেঁচাচ্ছে, "ওরে মেরে দিল রে, মেরে দিল রে…।" পিন্টা কিংকর্তব্য দাঁড়িয়েছিল, ঠাকমা-বুড়ি বলছে, "ওই তো খাইয়েছে।"

কিন্তু গাছপালা যাই খাক, লালমোহনের গায়ে ঘা পড়ছে যেন পিন্টার আঁতে ঘা মারছে কেউ। সে পারল না, দৌড়ে গেল সাধুখুড়োকে আটকাতে, সে একপ্রকার বলতেই এসেছিল, "খুড়ো, আমাকে দু'ঘা মারো লালমোহনকে ছেড়ে দাও।" বলতে হল না, পিন্টার ওপরেও রাগ ছিল সাধুচরণের, বসিয়ে দিল চওড়া ডাং পিঠের ওপর। দাদাকে মার খেতে দেখে মিন্টা কোথায় ছিল, সেও ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছে দাদাকে। মিন্টা মনে-মনে বলে, আমাকে দু'ঘা মারো, দাদাকে ছেড়ে দাও। তা সেও খেয়েছে দু'ঘা। ঠাকমা-বুড়ি বলছে, "ওরকম হয়, মার ছাড়াতে গেলে অমন দু-এক ঘা খেতে হয়।" চোয়াড়ে রাগ সাধুচরণের, পিন্টার পিঠ ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে, মিন্টার হাতের গাঁট সঙ্গে-সঙ্গে টোটিল হয়ে ফুলে গেল, আর লালমোহনের তো কথাই নেই, সারা শরীর ছড়া-ছড়া ফুলে উঠেছে, তিন-চার জায়গায় ক্ষতবিক্ষত।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল, লালমোহনের জন্য চুন-হলুদ নিয়ে এল সাধুচরণের বউ, সাধুচরণ ঘষে-ঘষে বাছুরের ব্যথায় চুন-হলুদ লাগাচ্ছে। আর ঠাকমা-বুড়ি কিঞ্চিৎ অদূরে ডান হাত নেড়ে-নেড়ে মুখে থুতু উঠিয়ে গাল পেড়ে যাচ্ছে দু' ভাইকে।

পিন্টা-মিন্টা গাল শুনছিল আর লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখছিল। কিসের যেন অগাধ লজ্জা। কিসের লজ্জা? কাঁঠাল-চারা খেয়ে গেছে বলে বাগালের লজ্জা, নাকি গোরুর পিঠে চিকিচ্ছে হচ্ছে মানুষের পিঠ ভোঁ-ভাঁ, তাই।

মিন্টার হাতের গাঁট ক্রমশ ফুলছে, একটা নরম সাদাটে শশার মতো দেখতে হয়ে উঠল হাতটা, সে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর কাটা পিঠ দিয়ে… যেমন ডুমুর গাছে কোপ মারলে ঝরঝর করে আঠা বেরোয়, তেমনই অবিরাম রক্ত গড়াচ্ছে পিন্টার। লুকিয়ে, ভীষণ লুকিয়ে দু'ভাই একজন আর-একজনের ব্যথায় থুতু লাগাচ্ছে।

কাঁদছিল দু'জনেই। পিন্টা চোখ মুছে বলল, "দাঁড়া রে ভাই, আমি যখন গোরু চরিয়ে ফিরে আসব, তখন জঙ্গল থেকে কোলাহুড়ির গাছ নিয়ে আসব, পুণ্যকাকার ওষুধ, ছিঁচে লাগালে ভাল হয়ে যাবে।"

মিন্টা বলল, "ওটা তো ব্যথার ওষুধ, তোর যে কেটে গেছে, তার কী হবে?"

"পুণ্যকাকা তাও বলে দিয়েছিল, ভুলে গেছি, দাঁড়া, গোরু চরাতে গিয়ে জিজ্ঞেস করে নেব।"

সন্ধেবেলা পুণ্যকাকার বাড়ি গেল পিন্টা-মিন্টা। পাঁচগেড়্যা মানে পাঁচটা ডোবা, এই নামেই গ্রামের নাম। জমিদার পাঁচকড়িবাবু নিজের নাম অক্ষয় অমর করে রাখার জন্য এই পাঁচটা ডোবা খনন করিয়েছিলেন। এই পাঁচ ডোবার শেষেই পুণ্যকাকার বাড়ি।

পুণ্যকাকা নল-সংক্রান্তিতে ঝাঁপান তোলে। চালুনি করে নাকি জল নিয়ে আসতে পারে। গোরুর গাড়িতে বসে গলার দু'দিকে দুটো সাপ জড়িয়ে তখন অমোঘ বাণীর মতো নাকি যা বলবে তাই হবে, ওই সময় অত্যাশ্চর্য বলে কিছুই রাখে না পুণ্যকাকা।

সেই ঝাঁপান তোলার রেওয়াজ করছিল। নিজেই ডমরু বাজাচ্ছে, নিজেই গাইছে:

বিষহরি মা মনসা চরণে স্মরণ গো
কৃপা করে দাও মা দেখা মোরা অভাজন গো।

চাঁদবেনে সদাগর তার পুত্র লখিন্দর
বাসরেতে কালনাগিনীর হইল দংশন গো।

পুন্নাকাকি বলল, "আয় রে বাপ, আয়।"

মায়ের আর-এক নাম 'পুন্নাকাকি'। "মাগো আমার পিঠ… মাগো আমার হাত…" তবে কেউ কিছু বলতে পারল না, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঝাঁপানের গান শুনছিল।

ওরা এসেছে আসলে ওষুধ নিতে, পিঠের আর হাতের। আজ পুণ্যকাকা গোরু চরাতে যায়নি কিংবা গেছে, হয়তো অন্য দিকে গেছে। জঙ্গল তো আর কম না, পাঁচগেড়্যার গ্রামের সীমানা থেকে বেরোলে মনে হবে পৃথিবী শুধু জঙ্গলে ঢাকা। কে বলেছিল, নাকি বইয়ের কথা, যে পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এখানে বাস করলে সেসব বইয়ের লেখকদের উলটো মনে হত, মনে হত পৃথিবীর চার ভাগই জঙ্গল। এখানকার কারও একটুও জঙ্গল ভাল লাগে না, সবচেয়ে বেশি রাগ গাছের ওপর, প্রত্যেকের একবার করে হলেও মনে হয়, দিই, গাছগুলোকে সব শেষ করে দিই। অথচ শোনে, কত লোক নাকি জঙ্গল দেখার জন্য পাগল। বিনপুরের জঙ্গলের পাশে একটা ফরেস্ট বাংলো আছে, মাঝে-মধ্যেই শোনে, কিছু লোক এসে সেখানে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন জঙ্গুলে লোকগুলোর ভীষণ ইচ্ছে হয়, ওই লোকগুলোকে দেখার জন্য।

না, এদেরও গাছ ভাল লাগে, তবে সে দরকারি গাছ। যেমন আম-জাম-কাঁঠাল-পেঁপে-কলা-সজনে-বাঁশ আর কাজুবাদাম। জঙ্গলের গাছ তো কোনও ইনকাম দেয় না, না কাটলে কোনও রোজগার নেই।

তবে এদের মধ্যে পুণ্যকাকার কথা আলাদা, তার শুধু ভাল-লাগা

নয়, সে ভক্তি করে, পুজো করে। পুণ্যকাকা গাছ উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে বলেই বোধ হয়।

পুন্নাকাকি যখন আবার ডাকল, "আয় রে বাপ, আয়!" তখন পুণ্যকাকা গান থামাল। হঠাৎ কী করে যেন চোখ পড়ে গেল পিন্টার পিঠের দিকে, মিন্টার হাতের দিকে, কী করে যে চোখ পড়ে যায়, মায়ের চোখ আর যমের চোখ, মুখও তো সামান্য বিকৃত করেনি তারা।

সমস্ত মানুষের প্রতি ভীষণ অশ্রদ্ধা জন্মে যাচ্ছিল পিন্টা-মিন্টার, ঠিক সেই মুহূর্তে পুন্নাকাকি মনুষ্য-সমাজকে বাঁচিয়ে দেয়, না হলে তো তাদের স্লোগানই হয়ে গিয়েছিল— যার মা নেই তার কেউ নেই, রা মানে কেউ নেই প্রায় তারা বসিয়েই নিচ্ছিল।

ওষুধ দিল পুণ্যকাকা। পুন্নাকাকি দিল যত্ন, ফুঁক, চুমু, চোখের জল।

পুন্নাকাকি কাঁদতে-কাঁদতে বলেই ফেলল, "তোদের যেতে হবে না, থাক আমার কাছে।" দু'জনকে বুকে জড়িয়ে বসল, "আমি ভিক্ষা মেগে তোদের খাওয়াব।" দুটো টাকা মাত্র ছিল পুন্নাকাকির কাছে, পুণ্যকাকার হাতে দিয়ে বলল, "তুমি যাও, বামুন-ডাক্তারের কাছ থেকে ওদের জন্য ওষুধ এনে দাও।"

পিন্টা সঙ্গে-সঙ্গে আঁতকে উঠে বলল, "না-না, আমরা ভাল আছি।"

মিন্টাও সঙ্গে-সঙ্গে, "না-না!"

পিঠের ক্ষত ও হাতের গাঁটিফোলা নিয়ে তো আর মানুষ মরে না।

পুণ্যকাকা বলল, "তোমাদের কোনও চিন্তা নেই, আমি ওষুধ দিয়েছি, ও একেবারে অবর্থ, কাল সকালে উঠেই দেখবি ঘা কোথায় আর ফোলা কোথায়, হা-হা-হা।"

কিন্তু সকালে কী হবে সে অন্য কথা, দু'ভাইয়েরই যন্ত্রণা বাড়ল রাতে, অসহ্য যন্ত্রণা, টিকতে পারছে না, শুয়ে-শুয়ে শুধু এপাশ-ওপাশ হচ্ছে। মার খাওয়ার রাত সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক, ও পুণ্যকাকার ওষুধই হোক আর যাই হোক। মিন্টা বলল, "দাদা রে, লালমোহন কেমন আছে যাবি দেখতে?"

তাদের কাছেই তো গোয়ালের চাবি থাকে।

"উ!"

"কী রে, তোর খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?"

"না, চ।"

খুব সন্তর্পণে গোয়াল খুলল, যেন না বেশি শব্দটব্দ হয়, ঠাকমা-বুড়ির ঘুম পাতলা, যদি বাইরেটাইরে বেরোয়, আর যদি দ্যাখে, তারা গোয়াল খুলেছে এই রাতের বেলা, তা হলে নির্ঘাত ভেবে বসবে— গোরু পাচার করছে পিন্টা-মিন্টা। গোরু চরাতে নিয়ে যায় ওতেই সন্দেহ, ছেলেকে বলে, "দ্যাক, চরাতে নিয়ে গিয়ে আবার পাচার না করে দেয়।"

অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে লালমোহনের কাছে গেল। গোয়ালে ঢুকেই সাড়া দিয়েছে পিন্টা, তার সাড়া পেলে কোনও গোরু আর পা'টি পর্যন্ত তুলবে না।

পিন্টা প্রথমে গিয়ে ডাকল লালমোহনকে, "লালমোহন!" মুখটা তুলে মুখে চুমু খেল, গলায় মুখ ডুবিয়ে আদর করল। মিন্টাও ততক্ষণে একহাতে আদর করতে লেগে গেছে। কিন্তু তার পিঠে হাত

আকাশে ওড়ার কথা □ একুশ — ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১৪ : প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের বিমান

১৯১৪ সালে যখন প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হল, বিমান আর শখের খেলা দেখাবার বা বিপদসঙ্কুল অভিযানের সামগ্রী থাকল না, নিমেষে পরিণত হল মারণাস্ত্রে। যুদ্ধ ঘোষণার সময়ে একদিকে ব্রিটিশ, বেলজিয় ও ফরাসিদের হাতে ছিল যথাক্রমে ৪৮, ২৪ ও ১৩৬টি বিমান, ও অন্যপক্ষে জার্মানদের হাতে ১৮০টি। গোড়ার দিকে বিমান ব্যবহৃত হত শত্রুপক্ষের সৈন্য সমাবেশের অবস্থান লক্ষ্য করা, আলোকচিত্র নেওয়া এবং গোলন্দাজ বাহিনীর কামানের গোলার নিশানা নির্দেশ করার কাজে। এর পর রেডিও সংযুক্তির ফলে বিমানের কার্যকারিতা আরও বেড়ে গেল। বিমান-বিধ্বংসী কামানের ব্যবহার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, গতিবেগ বাড়ানো ও অস্ত্রসম্ভার যোগ অপরিহার্য হয়ে পড়ল। যুদ্ধ শুরুর সময়ের উল্লেখযোগ্য ফরাসি বিমান ছিল মোরেন-সলনিয়ে স্কাউট। সেই সময়ের পক্ষে বিমানটি ছিল বেশ উপযোগী। বিমানটিতে ছিল বুলেট ডিফ্লেক্টর যন্ত্র, যাতে অন্যপক্ষের বিমানের গুলি এতে না লাগে। একটি বিমান জার্মানি এলাকায় ধরা পড়লে বিখ্যাত বিমান-নির্মাতা অ্যান্টন ফকার এটি দেখে জার্মান বিমানে অনুরূপ যন্ত্র যোগ করলেন।

অ্যাভ্রো—৫০৪ বিমান

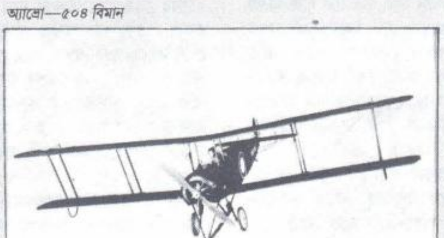

অ্যাভ্রো—৫০৪

সমসাময়িক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ বিমান, তৈরি হয়েছিল ৮০০০। এটিকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষণ-বিমান বলা হয়। এর মধ্যে ৩০০ বিমানে অস্ত্র যোগ করে জার্মান জেপেলিন ও বোমারু বিমানের হাত থেকে প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়।

অ্যাভ্রো—৫০৪ বিমানের বিশদ বিবরণ :

নির্মাতা : এ ভি রো, ম্যাঞ্চেস্টার
লম্বায় : ২৯·৫' ফিট (৯ মিঃ)
ডানার আয়তন : ৩৬ ফিট (১১ মিঃ)
যাত্রী-সংখ্যা : একজন বৈমানিক ও একজন যাত্রী
অস্ত্রসম্ভার : একটি স্থিরলক্ষ্য লিউইস মেশিনগান
গতিবেগ : ঘণ্টায় ৮২ মাইল (১৩২ কিঃমিঃ)
সিলিং : ১৩০০০ ফিট (৪০০০ কিঃমিঃ)
আকাশে একটানা ওড়ার ক্ষমতা : ৩ ঘণ্টা
এঞ্জিন : বিভিন্ন এঞ্জিন ব্যবহার হয়েছে—অশ্বশক্তি সংখ্যায়—৮০ নোম, ১০০ নোম মনোসুপেপ, ১১০ ক্লারজেট, ১১০ লা রোন, ৭৫ রোলস রয়েস হক, ১৩০ ক্লারজেট।

দিতে ভয় পাচ্ছে, যদি ব্যথার চোটে লাফিয়ে ওঠে, লালমোহন লাফালে একটা কিছু-না-কিছু অঘটন ঘটে যাবে।

"তোর খুব কষ্ট হচ্ছে, না রে ?"

দু'ভাই দু'দিক থেকে মুখ ডুবিয়ে জিজ্ঞেস করছে।

"আমাদেরও খুব যন্ত্রণা হচ্ছে," মিন্টা বলল।

"তোকে খামিদ-খামদানি চুন-হলুদ দিয়েছে, আমাদের তো··· তবু দ্যাখ, আমরা কাঁদছি না, দ্যাখ, দ্যাখ লালমোহন।"

বলে-না-বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল পিন্টা-মিন্টা।

আসলে লালমোহনের পিঠে চুন-হলুদ লাগানোর পেছনেও গৃহস্থের একটা স্বার্থ কাজ করছিল, সাধুচরণ খদ্দের ডেকেছে লালমোহনকে খুব শিগগির বিক্রি করবে, বিক্রি করে একটা পূর্ণবয়স্ক হালের গোরু কিনবে, ডানের বলদটা বড় রদ্দি হয়ে গেছে। পিঠে ফোলা দেখলে ব্যাপারি যদি কম দাম দেয়, এই ভয়েই ঠাকমা-বুড়ি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অত কাঁদনমাদন হয়ে গাল পাড়ছিল পিন্টা-মিন্টাকে।

মিন্টা জিজ্ঞেস করল, "দাদা রে, কত মাস হয়ে গেল, বাবা আসছেনি কেনে বল তো ?"

"আট মাস।"

"মোটর ভাড়া জোগাড় করতে পারছেনি ?"

"চার টাকা চল্লিশ, চার টাকা চল্লিশ— আট টাকা আশি, আরও ধর এদিক-সেদিক··· দশটা টাকা লাগবে।"

"বাবা আসার ভাড়া জোগাড় করলেই হয়ে যেত, আমাদের বেতনের পয়সা থেকে··· তা হ্যাঁ রে দাদা, আমাদের খাটালির পয়সা দিবে না ?"

"না-না-না ! আমরা তো পেটভাতা বাগাল, দু'বেলা খাবার মতোও নাকি খাটতে পারিনি আমরা, আমরা নাকি শুধু বুলে-বুলে খাই।"

অনেকক্ষণ চুপ হয়ে গেল দু'জনে। পিন্টার পিঠ টনটন করছে, সেজন্য শুতে পারল না, উঠে বসেছে, মিন্টার হাত টনটন করছে, সেজন্য সেও শুতে পারল না, উঠে বসল। নিজের খেয়ালেই পৃথিবী ঘুরে চলেছে, অন্ধকার সাড়া দিয়ে যাচ্ছে শঁ-শঁ করে, অনেক দূরে কী-একটা পাখি না পোকা না জন্তু খুব হালকা মৃদু কণ্ঠস্বরে একটা মোলায়েম ধ্বনি আছড়ে যাচ্ছে এই ভর নিশুতি রাতের গায়ে, সেও নিজের খেয়ালে।

আবার একবার পুণ্যকাকার ওষুধ লাগাল পিন্টা-মিন্টা।

"বাবা এলে চলে যেতাম।"

বলেই ফেলল মিন্টা, আর থাকতে পারল না।

"চলে যাব থাম না। পুণ্যকাকার কাছে মন্ত্র শিখছি, আমিও গুনিন হব। সাপ-কাটা ভাল করব, গোরুর দুধ-চালা বন্ধ করব, মানুষের রোগ-অসুখ-যন্ত্রণা ভাল করব, লোকের ভাল হলে লোক কত টাকা দেবে, তারপর আমি আর বাবাকেও মুনিশ খাটতে দেব না, তোকেও বাগাল থাকতে দেব না। পুন্নাকাকি যেমন পুণ্যকাকার হেলপার, 'এই শেকড়টা বাটো, এই পাতাটা থেতো করো' তুইও তেমনি···"

আশ্চর্য, পিঠ ও হাতের এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও দু'ভাই এই স্বপ্নের আনন্দে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরল।

"আমিও ঝাঁপান তুলব দেখবি।"

বলে পিন্টা নিজের হাঁটুকে ডমরু করে অত রাতে ঝাঁপান গাইতে বসে।

বিষহরি মা মনসা চরণে স্মরণ গো
কৃপা করে দাও মা দেখা মোরা অভাজন গো।

গান শেষ হতেই মিন্টা হঠাৎ বলে, "মা যদি আর দুটো বছর বেঁচে থাকত, তা হলে আমাদের কোনও ভাবনাই থাকতনি, তুই জোয়ান হয়ে যেতিস, আর আমিও··· হ্যাঁ রে দাদা, কত বছরে জোয়ান হয়, পনেরো বছরে ?"

পিন্টা আরও-আরও জোরে মনসা-স্মরণ সঙ্গীত গাইতে থাকে :

বিষহরি মা মনসা··· মিন্টা ততোধিক জোরে চেঁচিয়ে ওঠে, "মা, মা গো !"

ভাদ্রে পাকা তাল। ভোরবেলা এসে ঠাকমা-বুড়ি কোনও-কোনওদিন রাত চারটের সময় হাঁকড়ে তুলে দেয়, স্বজাতি হোক, তবু তো বাগাল, ছোঁয় না, এক-একদিন দূর থেকে ঢিল মারে, ভারী একটা কিছু এনে ফেলে দেয় ওদের ওপরে, "উঃ কী ঘুম, কালঘুম না কি রে তোদের ?" উঠলে বলে, "যা না রে, লোকে যে সব কুড়িয়ে নিল, আনলে তো তোরাই খেয়ে মরবি।" এরকম সময়

তাল নামটা আর উচ্চারণ করে না, বলে 'দুম'।

তাল থেকে দুটো জিনিস পাওয়া যায়— ক্বাথ বা মাড়ি আর আঁকুর হলে শাঁস। ঘুমচোখে অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে তাল কুড়িয়ে আনে পিন্টা-মিন্টা, ঠাকমা-বুড়ি উনুনশালে সার করে সাজিয়ে রাখে, উনুনশালে রাখলে পোকা হবে না, তারপর দু-তিনদিনের তাল মেড়ে পিঠে হয়। পিন্টা-মিন্টা দু'জনেরই খুব প্রিয় তালপিঠে। চব্বিশ-পঁচিশটা পিঠে এক-একজনই খেয়ে নিতে পারে। সাধু-খুড়িমা বানায়ও খুব সুন্দর। পাকা পদ্মপাতার মতো হলুদ দেখতে, যেমন দেখতে তেমনই স্বাদ। যত দেয় মনে হয় আরও নিই, মনে-মনে নিজের পেটকে গাল দেয়, 'কী রাক্ষস রে তুই', ঠাকমা-বুড়ির গালাগাল, "পেট না পুকুরঘাট রে তোদের, মরণ-খাবা খাচ্ছু না কি ?"

পিন্টা-মিন্টা দু'জনেই তাদের একেবারে শেষের পিঠেটি খুব আস্তে-আস্তে খায়, ভাল জিনিস শেষ হয়ে গেলে মানুষের আর কীই-বা থাকে, আর যাদের জীবনে ভাল জিনিস খুব কম আসে তাদের তো কথাই নেই। পিন্টা-মিন্টা দু'জনেরই ওই শেষ পিঠের সর্বশেষ অংশটুকুর ওপর দাঁত বসানো··· ওদের মনে হয় এক্ষুনি ভূমিকম্প হোক, ঝড় উঠুক, তুফান উঠুক, সব শেষ হয়ে যাক, তবু তাদের এই স্বাদটুকু যেন না শেষ হয়ে যায়।

প্রতিটি পিঠের দিন ছিল এরকমেরই ইতিহাস।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় কী খেতে হয়, তালকুর। প্রথমে লম্বা অঙ্কুরটা কেটে ফেলে দেয় তারপর কাঠের মুড়োর ওপর রেখে, এক কোপে না হলে তালকুর কাটার পক্ষে দু' কোপই যথেষ্ট, দু' ফাঁক হয়ে যায়, বেরিয়ে আসে শাঁস, আর শাঁসের তলাতেই দেহের ভেতরে লুকনো জীবনের মতো কিংবা সমুদ্র মন্থনের শেষে যেরকম অমৃত উঠে এসেছিল, সেরকম অভূতপূর্ব আস্বাদনের মাখন বেরিয়ে আসে। বাড়ির সবাই খায়, ঠাকমা-বুড়ি পর্যন্ত চেটেপুটে মাখন খায়, পিন্টা-মিন্টাকেই কেটে দিতে হয়। শুধু ওদেরকে কেউ খেতে বলে না। ওরা কেটে দেয়। আর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বাড়িসুদ্ধু সকলের তারিয়ে-তারিয়ে খাওয়ার রকম দ্যাখে।

কাতান নিয়ে লুকিয়ে কেটে খেতেও ওদের ভীষণ ঘৃণা হয় পিন্টা-মিন্টার। শুয়ে-শুয়ে মিন্টা বলছে, "দাদা রে, চ, আমি কাতান লুকিয়ে রেখেছি, সব তালকুর কেটে খেয়ে নেব চ, আমরাই তো তাল কুড়িয়ে এনেছি।"

পিন্টা বলল, "ছিঃ।"

মিন্টা বুঝল সত্যিই ছিঃ, যাদের মা নেই তাদের অত লোভ ভাল না।

গভীর অন্ধকারে সাদা পূর্ণ তালের কোমল শাঁসের সঙ্গে মা'র মূর্তিটা মিলিয়ে দেখতে-দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে পিন্টা-মিন্টা, শেষ পর্যন্ত তালকুর তালকুর থেকে যায়, কাতান কাতান।

দু'দিন কি তিনদিন পর সকালে উঠে কাজ সারছে পিন্টা-মিন্টা, পিন্টা গোরু বের করে গোরুকে খড় দিচ্ছে, মিন্টা ভাঙা কুলোয় ছাই নিয়ে বেরিয়েছে, এমন সময় দেখল সাধুচরণের সঙ্গে সেই গোরু কেনার কষাই লোকটা, সে আগেও একবার এসেছিল। লালমোহনকে বিক্রি করবে সাধুচরণ, ব্যাপারি কিনতে এসেছে। আগের বার দরদামে পোষায়নি বলেই লোকটা ফেরত যায়। সাধুচরণ দর বলেছিল পাঁচশো, কষাই বা ব্যাপারি উঠেছিল তিনশো পঁচিশ। কষাই আরও কিছু দর বাড়াবে বলেই এসেছে, এই আনন্দে বাড়িতে পরব পড়ে গেল। দৌড়া-ছোটা করে তাকে তাড়াতাড়ি বসতে আসন দিল, একজন কি, একসঙ্গে দু'জন দুটো আসন নিয়ে এসেছে। চুরকু-দাড়ি আছে লোকটার, কী জঘন্য দেখতে, হেসে বসল। সাধুচরণের মেয়েকে 'খোকি-মা', 'খোকি-মা' করছে, ছেলেদের 'খোকাবাবু', 'খোকাবাবু' করছে। তার জন্য চা হচ্ছে, সাধু-খুড়িমা আদা ছিঁচে চা করছে। সাধুখুড়ো ডিবে খুলে বিড়ি দিল, পিন্টাকে বলল, "যা তো, একটু আগুন নিয়ে আয়।" পিন্টা ছুটে গিয়ে চাটু ভরতি আগুন তুলে এনেছে, কষাই বিড়ি ধরাচ্ছে একেবারের চাটুর গর্তে মুখ নিয়ে গিয়ে, পিন্টা চাটুর ডাঁটিটা ধরে আছে। তার মনে হচ্ছে দিই আগুনের চাটুটা লোকটার মুখে থেবড়ে।

কষাইয়ের দর চলছিল, কেসে শুরু করল, "অ্যাঁ-হ্যাঁ, তা হলে সাধুদা, তোমার ফাইনল দরটা বলো দিখি, লঘায় কুলালে লিব না হলে চলে যাব।"

ঠিক ওই রকম দর তোলার মাঝখানে হঠাৎ ঠাকমা-বুড়ি মহা প্রলয় ঘটে যাওয়ার মতন বুক ফাটিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। কী হল, কী হল? না, মাছ সাঁতলে শিকেয় তুলে রেখেছিল, বেড়ালে কীভাবে উঠে খুলে ফেলে সব মাছ খেয়ে গেছে।

বেড়ালে মাছ খাওয়ার জন্য এরকম আর্তনাদ! এতে ঠাকমা-বুড়ির কোনও হাত নেই, তার শরীরের যন্ত্রগুলো এখন আর কথা শোনে না, এক বললে এক করে, এর সবচেয়ে বড় সাক্ষী পিন্টা-মিন্টা। ঠাকমা-বুড়ি যে আওয়াজ বের করতে চায় ঢিলেঢালা যন্ত্রপাতির জন্য তা একটু মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায়, যেমন পিন্টা-মিন্টার গালাগালগুলো—ঠাকমা-বুড়ির কী দোষ। কিন্তু কী বদমাশ বেড়াল কিংবা ঠাকমা-বুড়ির কী যন্ত্রপাতি যে, মাছ তো গেলই, এমন অর্থাগমকেও নষ্ট করে দিল, ব্যাপারি পাঁচ টাকা, দু'টাকা, সাতটাকা করে যাই হোক দর উঠছিল, আর কি উঠবে!

এই ডাহি-বনাঞ্চলে খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে মাছই সবচেয়ে মহার্ঘ, তার ওপর নোনা-চিংড়ি, যা এখানকার হাটে-বাজারে প্রায় পাওয়াই যায় না। সেই মাছ বেড়ালে খেয়ে নিলে···না, ঠাকমা-বুড়ির আর্তনাদ খুব একটা বাজে আর্তনাদ নয়।

সাধুচরণ হঠাৎ রেগে টং হয়ে উঠল এবং তড়িৎ খামারের উখুন-ডাংটা টেনে নিয়েই উড়োপাক খেতে লাগল, "আজ ওকে শেষ করব, তবে আমার নাম সাধু।"

ছুটছে সাধুখুড়ো, বেড়ালকে তাড়া করছে, দেখতে-দেখতে বাড়ির সবাই বেরিয়ে পড়ল, কারও হাতে ইট-চাকলা, কারও হাতে কাতান, কারও হাতে···· দেখাদেখি কষাইও একটা চাবুক নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে, যদি তার দ্বারা মানুষের কিছু উপকার হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেড়ালটা এমন জায়গায় লুকোল এত লোক কেউ খুঁজেই পেল না। একমাত্র মিণ্টাই জানে কোথায় লুকোতে পারে। বেড়ালটা রোজ রাতে তার কাছে এসে শোয়, ঘড়ঘড় করে নাক ডেকে ঘুমোয়, মিণ্টা বুকে চেপে আদর করে, চুমু খায়। কিন্তু সেই মিণ্টাও রেগে গেল, দিক, ওকে মেরে দিক, আমি না খেয়ে, লুকিয়ে আমার ভাগের ছোট পিস হলেও তো তোকে···কাল রাতেও তো খাইয়েছি, আর তুই কি না···

মিন্টা প্রায় বলে দিতে যাচ্ছিল কোথায় লুকিয়েছে চোরটা, কিন্তু সেসময় মিন্টা দেখল পিণ্টা আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

"কী হল?" জিজ্ঞেস করল মিণ্টা।

"না, কিছু নয়।"

"ধোবি তো চোর, লাফ দিয়ে শিকে থেকে···"

"সাধুখুড়ো কি এজন্য এত রেগেছে নাকি।"

"তবে?"

"ব্যাপারি আর মাত্র পঞ্চাশ টাকা দাম উঠেছে লালমোহনের, সে বলে দিয়েছে আর-এক পয়সাও বেশি দিতে পারবে না, ওই রাগ গিয়ে পড়েছে ধোবির ওপর।"

কিন্তু ব্যাপারি যে টাকাটা দিচ্ছে সেটা কম না বেশি এরা দু'ভাই তা ধরতেই পারল না, তবু ওই ব্যাপারি লোকটার ওপরেই প্রচণ্ড রাগ হতে লাগল তাদের। টাকার জন্য নয় লালমোহনকে নিয়ে চলে যাবে—এজন্য। ওই টাকাটা যদি তারা পেত, তা হলে সাধুখুড়োর হাতে দিয়ে বলত, "খুড়ো নাও, লালমোহনকে যেতে দিও না।"

সাধুচরণের হাতে মার খাওয়ার দিন থেকে লালমোহন পালটে গেছে, তার আর সে-দুর্দান্ত ভাব নেই, এমনি প্রাণ বাঁচানোর জন্য যা-একটু খায়, পিন্টা তার গলার কাপড়ে কত হাত বুলিয়ে, গালে গাল ঠেকিয়ে কত অনুরোধ করে, "আর দু'গাল খেয়ে নে, পেটটা ঢাকলা হয়ে আছে, ও লালমোহন!" কিন্তু সে অত্যন্ত অনাসক্ত ভঙ্গিতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। হঠাৎ দুম করে ঝটকে গেল লালমোহন, সেজন্য কষাই তিনশো পঁচাত্তরের বেশি কিছুতেই উঠল না।

গেরস্থের দড়ি খোলা হল লালমোহনের, কষাইয়ের দড়ি পরল গলায়। পুরনো ছেঁড়া-পচা দড়ি, বিক্রি হয়ে যাওয়া গোরুর দড়ি অন্য গোরুকে দিতে নেই, সেজন্যই সাধুচরণ দড়ি বদলায়নি লালমোহনের, শুধু-শুধু একটা নতুন দড়ি খরচা হবে, ওটা তো পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে আসতে হয়। সাধুচরণ মিণ্টাকে বলল, "যা, ওটা জলে ফেলে দিয়ে আয়।" মিণ্টা যাচ্ছিল, পিন্টা টিপল, বারণ করল ফেলতে, ছেঁড়া হোক, লালমোহনের দড়ি তো!

কষাই টানতে শুরু করেছে লালমোহনকে, কাতার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সকলে, সাধুচরণের হাতে হাত-ভর্তি দশ টাকার নোট কতকগুলো, সে খুব লুকিয়ে ধরতে চেয়েছিল তবুও বেরিয়ে আছে জলছবির দাগটা, সাধুখুড়োর হাতের টাকার স্বাদ গুণ করে স্থবির করে ফেলছিল প্রত্যেককে।

লালমোহন যাচ্ছিল। বেশ যাচ্ছিল। কিন্তু যেতে-যেতে সে যখন বুঝতে পারল চিরদিনের জন্য তাকে চলে যেতে হচ্ছে, তখন সে আর পা তুলছে না। কষাই, এত বড় কষাই,তার হেঁচকা টান সহ্য করেও লালমোহন মাটি কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকমা-বুড়ির গাল পিন্টা-মিণ্টাকে, "দাঁড়িয়ে দেখছ কী রে সর্বনাশারা, একটু খেদিয়ে দিবি তো।" আরও অনেক কথা শুনে গেল পিন্টা-মিণ্টা ঠায় কাঠের মতো। কী করবে, কী করে লালমোহনকে তাড়াতে হয় তারা যে ভেবেই পাচ্ছে না।

সাধুখুড়ো খামারের সেই উখুন-ডাংটা নিয়ে এসে পিন্টার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "যা, বড় রাস্তায় তুলে দিয়ে আসবি যা।"

পিন্টা লাঠি নিল না, আস্তে করে লেজে হাত দিল, গায়ে দুটো আলতো স্নেহসূচক চাপড় মারল, লালমোহন একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল, তারপর যেন কিছুই হয়নি এরকম স্বাভাবিকভাবেই চলতে শুরু করল। পিন্টা কুলির বাঁক পেরিয়ে আর থাকতে পারে না, বুক চেপে গঁ-গঁ করে, অসম্ভব শক্তিতে শব্দ চেপে কাঁদতে-কাঁদতে লালমোহনের পেছন-পেছন হাঁটতে থাকে।

লালমোহন তখনও বড় রাস্তায় উঠেছে কি ওঠেনি, এদিকে মিণ্টা চুকচুক করে ধোবিকে খুঁজছিল। ভেবেছিল বেড়ালের রাগ সকলের পড়ে গেছে, লালমোহন চলে গেল আর সেখানে কোথা নোনা-চিংড়ি, ধোবিকে ধরে এবার আচ্ছা করে বকে দেবে, আচ্ছা কষে কান মলে দেবে।

ধোবি মিণ্টার গলা পেয়ে দিব্যি লেজ নাড়তে-নাড়তে বেরিয়ে আসে হামার-ঘরের তলার কাঠ-জঞ্জালের ভেতর থেকে। কী সেয়ানা, মুখে কোনও শব্দ করছে না। এমনিতে বেড়ালজীব মিউ-মিউ না করে থাকতে পারে না। ওরে ধোবি! ওর গালপাট্টার দু'দিকে দুটো আঙুলে-টানা আঁকের মতো সাদা দাগ আছে বলে ধোবি, সাদাকে বলে ধোবো। কিন্তু কোলে তুলে নিয়ে মারবে কী, ও এমন করে বুকে লেপটে আছে যে ওকে বকতেই ভুলে গেল মিণ্টা। কিন্তু এত লোকজন, আজ আবার টাকার উৎসব, ছোট-বড় সকলের প্রকৃতি একটু চঞ্চল, পালানো গেল না, ধরা পড়ে গেল।

"তোর গামছা ঢাকা কী, কী নিয়ে পালাচ্ছ? মা··· ঠাকুমা···"

গামছাসুদ্ধ টিপে ধরেছে।

"অ্যাঁ, এ যে সেই··· তুই-ই তা হলে লুকিয়ে রেখে সকলকে হয়রান করলি, দাঁড়া বাবাকে ডাকি, বাবা····"

গোলমাল শুনে সবাই ছুটে এল। ঠাকমা-বুড়ি গাল দিচ্ছে। সাধুচরণের বড়ছেলে, মেজোছেলে দুটো করে চড় মেরে নিল নিজেদের পছন্দমতো জায়গায়। সাধুচরণ লালমোহন-বেচা টাকা গচ্ছিত করে এসে বলল, "তোদের কী হল কী?"

"এই যে দ্যাখো না।"

গামছা তুলে দেখাল।

"ও···দাঁড়া, এক কাজ কর।"

বলে একটা দড়ি নিয়ে এসে ধোবির গলায় বেঁধে দিয়ে বলল, "যা এটাকে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আয়, অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ছাড়বি।"

ধোবি বুঝতে পেরেছে তাকে নিয়েই গোলমাল, সে আরও নিবিড়ভাবে মিণ্টার বুকে মুখ গুঁজেছে।

সাধুচরণের মেয়ে আপত্তি করল, "না বাবা,ওকে যেখানে ছাড়ো,ও আবার ঠিক চলে আসবে, ওকে মেরে ফ্যালো। এত মাছ সব···"

গামছার ওপরেই এক থাপ্পড় দিল।

বড় ছেলে বলল, "কিছু করতে হবে না বরং ঢাকা দিয়ে রাখি দুধ-ভাতের সঙ্গে একটু ফলিডল মাখিয়ে দুপুরবেলা দিয়ে দেব।"

মেজোছেলে বলল, "উঃ, আমাকে দাও না, ছাড়ো, আমি এক আছাড়ে ওর দম বের করে দেব।"

ছোটমেয়ে বলল, "গলায় পাথর বেঁধে গেড়্যার জলে ফেলে দিলে আর কিছু করতে হবেনি।"

ধোবির মৃত্যুর রায় হয়ে গেছে, এখন তার প্রক্রিয়া নিয়ে মতভেদ হচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত ঠাকমা-বুড়ির পরামর্শই সাব্যস্ত হল, "আমরা কেন

প্রিয় লেখক, প্রিয় বই

বিমল কর কয়েকটি দুর্ধর্ষ বই লিখেছেন ছোটদের জন্য। কোনোটি তুমুল হাসির, কোনোটি জমজমাট রহস্য-রোমাঞ্চ, কোনোটি আবার কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী। যেমন, 'ওআণ্ডারমামা'। জাপান-ফেরৎ এক আজব মামার আজগবি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার এ এক প্রচণ্ড হুল্লোড়ময় কাহিনী। আবার, 'কাপালিকরা এখনও আছে'তে এ-যুগের এক কাপালিকের গা-ছমছম কাণ্ডকারখানার রহস্য কীভাবে ধরে ফেলল দুই কিশোর ও তাদের ম্যাজিশিয়ান বন্ধু কিকিরা, তারই দুর্দান্ত বিবরণ। এই তিন মূর্তিরই রহস্য-ভেদের তুখোড় কাহিনী 'জাদুকরের রহস্যময় মৃত্যু'। আরেকটিও— 'রাজবাড়ির ছোরা'। 'হারানো জীপের রহস্য' নামের অসামান্য এক কল্পবিজ্ঞান কাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে 'রাজবাড়ির ছোরা'র সঙ্গে ; অর্থাৎ দু-দুটি উপন্যাস একসঙ্গে, এক বইতে। 'পাখিঘর'ও রহস্যকাহিনী হিসেবে দারুণ জমজমাট। আরও দুটি ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস, 'অলৌকিক' এবং 'কিশোর ফিরে এসেছিল'। একটিতে মানুষের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয়, অন্যটিতে এক মৃত মানুষের পুনরাবির্ভাব। প্রত্যেকটি অসাধারণ। যেমন লেখায় তেমনি বিষয়ে। এমনই আরেকটি দুর্ধর্ষ নতুন বই 'হারানো ডায়েরির খোঁজে'।

বিমল করের কিশোর গ্রন্থ-সম্ভার।

ওআণ্ডারমামা ১০·০০ কাপালিকরা এখনও আছে ১২·০০ রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো জীপের রহস্য ২০·০০ অলৌকিক ১০·০০ কিশোর ফিরে এসেছিল ১০·০০ পাখিঘর ১০·০০ জাদুকরের রহস্যময় মৃত্যু ১২·০০ কালবৈশাখীর রাত্রে ১২·০০ হারানো ডায়েরির খোঁজে ১২·০০

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩১-৪৩৫২

আরও 'আনন্দ'-উপহার

টেনিদাকে নিয়ে

আশা দেবীর
আসল টেনিদা ১০·০০

বয়ঃসন্ধির গল্প

সন্তোষকুমার ঘোষের
দুপুরের দিকে ৮·০০

অপরূপকথা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
বুড়ো আংলা ১৫·০০

শৈলেন ঘোষের
স্বপ্নের যাদুকরী ৮·০০
টোরা আর বাদশা ৮·০০
খুদে যাযাবর ইসতাসি ১২·০০
আবু ও দস্যুসর্দার ১০·০০
ইতিমিচি সাহেব ১০·০০
কালাজুজু ৮·০০
দুঃসাহসী দুই বুড়ো ১০·০০
বনসবুজের দ্বীপে ১০·০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৮·০০

শান্তি লাহিড়ীর
আংলা বাংলা ৮·০০

কার্তিক ঘোষের
হিজিবিজির দেশে ৬·০০

গিরিধারী কুণ্ডুর
টংসা চু ৬·০০

মিছামিছি পাপের ভাগীদার হতে যাব রে ? জঙ্গলে নিয়ে যা, নিয়ে গিয়ে গাছের সঙ্গে ভাল করে বেঁধে রেখে চলে আসবি, সেখানে শিয়াল-মিয়াল কত কী আছে, খেয়ে নিবে, চুকে যাবে।"

সঙ্গে-সঙ্গে উৎসাহের বন্যা বয়ে যায় দুয়োর চত্বরে।

সাধুচরণের মেজোছেলে ধোবির গলার দড়ি ধরে টান দেয়, হ্যাঁচকা টান, মিন্টার কোল থেকে আঁচড়ে পড়ে ধোবি। খানিকটা উধড়ানো হয়ে যায় মিন্টার হাত। কিন্তু ধোবিও লালমোহনের মতো বায়না ধরল, যাবে না, কিছুতেই যাবে না, সেও পা টিপে ধরল, বেড়ালের পা টিপে ধরা মানে মারাত্মক, বেশি টান দিলে পাগলের মতো গঁ-গঁ করছে, এদিক-সেদিক ছুটছে, সাধুচরণের সব ক'টা ছেলেমেয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছ। অবশেষে ঠাকমা-বুড়ি গাল জুড়ল এবং সাধুচরণ লাঠি নাড়ল মিন্টাকে, "যা, নিয়ে যা, এখান থেকে এক্ষুনি নিয়ে গিয়ে দিয়ে আয় !" মিন্টা আবার কোলে তুলে নেয়, এবার ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে থাবা জোড় করে ধোবি, আর কী যেন অনবরত বলতে থাকে মিন্টাকে।

মেজোছেলে দড়ি ধরে আগে-আগে যাচ্ছে, না গেলে মিন্টা হয়তো কোথাও রেখে এসে বলবে···জন-জামাই-ভাগনা, তিন নয় আপনা, 'জন' মানে বাগাল।

কুলির মোড় পেরোতেই হঠাৎ যেন দৈববাণী শোনে মিন্টা : ভগবানের অভিশাপে বেশির ভাগ মানুষই এখন কষাই হয়ে যাচ্ছে, কষাই-কষাই-কষাই-কষাই···

সারাদিন আর দেখা হয়নি দু'ভাইয়ে, দেখা হল রাতে, শুয়ে-শুয়ে মিন্টা জিজ্ঞেস করছে, "যার মা নেই তার রা নেই, না রে দাদা ?"

রা মানে লালমোহন, রা মানে ধোবি।

পিন্টা বলল, "হ্যাঁ।"

পিন্টা-মিন্টা গোরু-মোষের লেজের চুলে ফাঁদ বানায়। পাখি ধরে। মাঠ থেকে ধান কুড়িয়ে এনে পায়রার খাবার দেয়। নোটন পায়রার পায়ের লোমে নাক ডোবায়।

আশুদ-আঠা গরম করে আঠাকাঠি তৈরি করে টিয়া ধরে, চন্দনা ধরে, শ্যামলতা ছিঁড়ে এনে শিকলি বানায়, পায়ে পরিয়ে দেয় টিয়া চন্দনার। বন্দী করার জন্য নয়, ভালবাসার অধিকার বিস্তারের জন্য, একবার পিন্টা বলে রাধাকৃষ্ণ, একবার মিন্টা বলে রাধাকৃষ্ণ।

মানুষ ভাবে মানুষের সংসার ছাড়া আর সংসার হয় না। কিন্তু পিন্টা-মিন্টা দেখল, আরে পাখি-পশু-কীট-পতঙ্গ এদের নিয়েও তো দিব্যি···এই ভাল, মনুষ্যহীন সংসার নিয়েই দিব্যি আছে পিন্টা-মিন্টা।

চারটে কোলা ব্যাঙ পুষেছে, ইয়া বড়, ওদের মাছি ধরে ধরে দেয়, খপ করে একহাত জিভ লেলিয়ে যখন আধার টেনে নেয়, তখন দেখবার মতো। মাকড়সাকে নিয়ে এসে কোণে কোথাও অধিষ্ঠান করিয়ে বলে, "নাও, পৃথিবী বেড় দেবার মতো বিশাল একটা জাল বানাও দেখি।"

ক্যারকেটা একটা জংলি পাখি, পিন্টা বলে, "ক্যারকেটা আমার ব্যাটা।" খুব ছোট্ট পাখি। বাঁশ-কঞ্চির ঝাঁপে ফাঁদের বেড় দিয়ে ভেতরে একটা ঘুরঘুরে পোকা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখে, দূর থেকে ওই ছোট-ছোট পাখিগুলো ঠিক নজর ছুঁড়ে দেখতে পায় আর সঙ্গে সঙ্গে পড়িমরি লাফ খেয়ে ছুটে আসে পোকা খেতে। অমনি ফাঁদে আটকে যায়।

পাখি ছোট হলে কী হবে নাকি খুব মিষ্টি সুস্বাদু মাংস। সাধুচরণের মেজোছেলে কবে কোথায় খেয়েছিল, সেই স্মৃতিতে পিন্টা-মিন্টা ধরে নিয়ে গেলেই তারা সমবেতভাবে ক্যারকেটা খাওয়ার জন্য আড়ি করে। মেজোছেলের সঙ্গে একদিন রীতিমত হাতাহাতিই হয়ে গেল পিন্টা-মিন্টার। সে ছাড়বে না, ওরাও ছাড়বে না। পিন্টা বলল, "পুষবে তো দিতে পারি।" ঝাঁপের একদিকে ধরে আছে পিন্টা, একদিকে মেজোছেলে। "এঃ পুষব, খাব, মেরে কুটকাট করব এক্ষুনি, ছাড়-ছাড় বলছি।"

সাধুচরণের বড়ছেলেও এসে যোগ দিল ভাইয়ের সঙ্গে, শোনাশুনি ঠাকমা-বুড়িও।

পিন্টা রাগে ফুঁসছে, ক্ষোভে কাঁদছে, "তোমরা এইটুকু পাখিটাও খাবে ছিঃ ছিঃ !"

তার চুল ঝুঁটিতে ধরল বড়ছেলে, "না হলে তোকে খাব।"

হঠাৎ মিন্টা আলগা বুঝে একসময় এক হেঁচকা টানে পাখিটাকে ছাড়িয়ে নেয় ওদের হাত থেকে, তারপর কাউকে প্রস্তুত হতে না দিয়েই ফুড়ুত করে উড়িয়ে দেয় আকাশে।

নাতিদের সুখের ভোজন-পাতে এরকম ধুলো ছিটিয়ে দিল যারা প্রাণ থাকতে থাকতে ঠাকমা-বুড়ি তাদের ছেড়ে দেবে না, বকে ভূত ভাগিয়ে দেবে, "হ্যাঁ রে, তোদের কঞ্চি না তোদের গোরুর চুল যে পাখিটা তোদের হয়ে গেল।" আর ছেড়ে দেবার পর ঠাকমা-বুড়ির গালাগাল-বকুনিতে মাটি পর্যন্ত তলতল করতে লাগল।

কিন্তু পিন্টা-মিন্টার কানে কোনও বকাঝকাই ঢুকল না, এমনকী বড়ছেলে-মেজোছেলে ঠাস-ঠাস করে চাড় বসিয়ে যাচ্ছে পিন্টা-মিন্টার গালে, ওতেও কোনও হেলচেল হল না তাদের। অসম্ভব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল পিন্টা-মিন্টা। ক্ষুদ্র পাখির মনোসুখে উড়ে যাওয়া দেখতে দেখতে তারা সমস্ত লাঞ্ছনা জয় করে, সমস্ত কষ্ট দমন করে।

তারা ধীরে ধীরে জেনে যায় মানুষ কী লোভী, একটা খরগোশ বাচ্চা জঙ্গল থেকে ধরে এনেছে, তাকেও কাঠের বাক্সের মধ্যে বড় করছে কিলো-দেড় হলে কেটে খাবে বলে। সুতোয় বেঁধে একদিন একটা সোনালি কাঁকড়া ধরে এনেছিল পিন্টা-মিন্টা, পুষবে। তাকে দেখেও জিভে জল। শুধু খাদ্য বলে নয়, যদি কাটা-ঘুড়ি ধরে আনে, ওতে যদি সুতো থাকে, তা হলে সেটুকু সুতোও চেয়ে নেয় কাপড় সেলাই করবে বলে, যদি একতাল এঁটেল মাটিও নিয়ে আসে, তা হলেও সেটা নিয়ে নেয় ঘরের চালার ফাটা টালিতে বৃষ্টি পড়া বন্ধ করার জন্য।

এইসব স্বার্থপর মানুষ দেখে দেখে বড় ক্লান্ত ও ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছিল পিন্টা-মিন্টা, সেজন্যই বোধহয় মানুষের একদম অদরকারি জিনিসপত্র, পোকামাকড়, লপ্পালা দিয়ে তারা আলাদা একটা সংসার তৈরি করতে চাইল। তারা কঞ্চি কেটে শ্যামলতা দিয়ে বেঁধে বেঁধে করল একটা প্রজাপতির ঘর, রং-বেরঙের প্রজাপতিতে ভর্তি করে ফেলল, টাটকা ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে এনে তাদের মধু খেতে দেয়। যখন প্রজাপতিগুলো ডানা মেলে ফুলের মধু খায় তখন পিন্টা-মিন্টার কাছে সমস্ত জগৎটা রামধনুময় হয়ে ওঠে।

একটা গিরগিটির ঘর, একটা আঞ্জোনির ঘর, একটায় থাকে শুধু গঙ্গাফড়িং, ফড়িং কী খায় ? শিশির-ভেজা মাটির রস খায়। চামচিকের প্রিয় মশার মাংস, জোনাকি যে কী খায় ? জোনাকি, শ্যামাপোকা, জলঘূর্ণি, জলে অবিরাম ঘূর্ণি তুলেই চলেছে। যারা কী খায় বুঝতে পারে না, পিন্টা-মিন্টা তাদের ছেড়ে দেয়, ওরা সবাইকে নিয়ে একটা সুখের সংসার গড়ে তুলবে, কাউকে কষ্ট দিতে পারবে না, কখনও না।

ভাল বিছানা পেতে দেয় ল্যাদা পোকাকে, ওরা শুয়ে থাকতে সবচেয়ে ভালবাসে। থাক শুয়ে, খাবার পৌঁছে দেব। ল্যাদা খায় ধানের কঁক জাতীয় গাছের সবচেয়ে নরম অংশ। দুধ-ধানের মালা গেঁথে ঝুলিয়ে দেয় গন্ধি পোকাদের জন্য।

কেঁচোই আছে সাত রকমের। আলাদা উস্করা মাটির ওপর তাদের থাকবার ঘর করে দিয়েছে। সকাল-সন্ধে জল ছিটিয়ে মাটি ভিজিয়ে

শব্দসন্ধান **রঞ্জন**

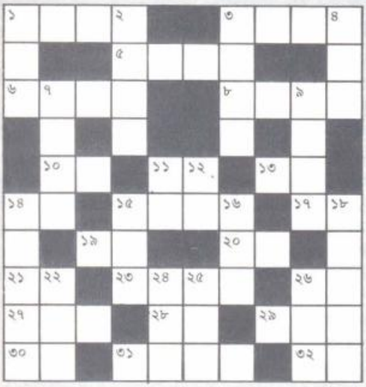

সংকেত : **পাশাপাশি :** (১) বায়ু ও জলের উপাদান। (৩) রামায়ণ-মহাভারতকে যা বলা হয়। (৫) সরস্বতী পুজোর পরদিনের অনুষ্ঠান ; (৬) বিসর্জন। (৮) যাকে বধ করা হচ্ছে। (১০) ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির। (১১) ব্যায়ামবিশেষ। (১৩) ছুরি। (১৪) এটাও ধারালো অস্ত্র। (১৫) কম্পমান, কাঁপুনির ভাবপ্রকাশ। (১৭) অনুভূতি, বোধ। (১৯) কল্যাণ, মঙ্গল। (২০) কাজলচূর। (২১) এই পাখির আর-এক নাম বসন্তসখা। (২৩) অবচীন যুগ। (২৬) গত বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ'। (২৭) গাছ। (২৮) হাতে লেখে, নাকে দেয়। (২৯) গাছবিশেষ অথবা তার ফুল। (৩০) তৃতীয় বেদ। (৩১) রামের এক পূর্বপুরুষ। (৩২) গ্রহণ করুন।

উপর-নীচ : (১) বজ্র। (২) দেশের বা রাজ্যের সীমারেখা এরা মানে না। (৩) দুঃখে দুঃসংবাদে মানুষ যা হয়। (৪) ভাতের সঙ্গে খাদ্য। (৭) আদিকবির আদি নাম। (৯) এর খুব মারের হাত। (১১) ভয়ের সমার্থক। (১২) নাকে পরে। (১৪) খিদেতেষ্টা। (১৫) থেমে থেমে চলা। (১৬) পয়গম্বর। (১৮) রামচন্দ্র। (২২) বর্ষার ফুল। (২৪) লিপি, লেখ। (২৫) আর্ত। (২৬) কথার ফোড়ন।

গত সংখ্যার সমাধান

ম	জ	লি	স			সা	ন্দী	প	নি
রী			তী	র	ন্দা	জ			শা
চি	ত্রা	ঙ্গ	দা			ঘ	ট	মা	ন
	ণ		হ	রি	দ্বা	র		ল	
	ক	পি					সাঁ	কো	
বা	র্তা		আ	জ	গু	বি		শ	শ
ৎ		নী	র			ম	ধু		র
স	ন		বি	প্র	ক	র্ষ		বী	ণা
রি	ক	শা		তি	ল		ভু	জ	গ
ক	ল		স	ভা	স	দ		ন	তি

দেয়, নইলে তো মাটি যত শুকনো হবে, ওরা তত নীচের দিকে পালাবে। কেঁচোরাও তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে এখানে সবাই মিলে বেশ সুখেই বসবাস করছে।

কিন্তু এও একদিন সাধুচরণের সংসারের লোকেদের কাছে চক্ষুশূল হয়ে উঠল, যা মানুষের প্রয়োজনে লাগে না তা তারা তাদের এক্তিয়ারেই রাখতে চায় না। ঠাকমা-বুড়ি বলতে লাগল, "কেঁচো গুয়াপোকায় চারপাশ ভরে দিল গো, টিকা দায়। দূর কর, বাগাল দুটাকেই দূর কর।"

সাধুচরণের বড়ছেলে ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে ফেলল প্রজাপতির ঘর, গঙ্গাফড়িং, ক্যারকেটা পাখির খাঁচা। মেজোছেলে ঢিল মেরে থেঁতলে দিল চিকন আঞ্জোনির লেজটা, থেঁতলানো লেজটা মাটিতে চিট খেয়ে বসে গেছে, সে না পারছে নড়তে না পারছে···গিরগিটিগুলো সব চলে গেছে, সব'কটা গঙ্গাফড়িংকে খাঁচাসুদ্ধ তুলে নিয়ে গিয়ে সারডোবায় গোবর জলে ফেলে দিয়েছে, সার-জলে হাবুডুবু খেয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে ফড়িংগুলোর।

পিন্টা-মিন্টা সেদিন কাজ সেরে এসে দেখে অবাকের চাইতেও অবাক হয়ে যায়। বিশাল অগ্নিকাণ্ড, ভয়াবহ বন্যা, প্রচণ্ড ঝড়, প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হলে যেমন হয়, কিংবা মা মারা গেলে, পিন্টা-মিন্টাকে সেরকমই ভেঙে চুরমার করে দিল। অনেকক্ষণ পর কাঁদতে কাঁদতে মিন্টা জিজ্ঞেস করল, "মা আর কোথাও নেই, না রে দাদা ?" সে বোধহয় মা মানে দয়া-মায়ার কথা বলছিল, নাকি মা মানে ভগবান ?

পিন্টা বলল, "না, কোথাও নেই।"

আরও খানিকক্ষণ পর হঠাৎ পিন্টা বলল, "চ।"

"কোথায় ?"

"পুণ্যকাকার কাছে।"

"পুণ্যকাকা তো শুধু মানুষের কিছু হলে তার ভাল করার মন্ত্র জানে, ফড়িং প্রজাপতি আঞ্জোনি এদের কী করবে ?"

"না, এদের ভাল করার মন্ত্রও জানতে হবে, যদি জানে তা হলে এ-মন্ত্রই আগে শিখব। নে চ।" দৌড়তে লাগল দুজনে।

কিন্তু পুণ্যকাকা তো ওদের মন্ত্র জানে না। সে শুনে অবাক হয়ে গেল, "পোকা-মাকড়ের মন্ত্র !"

মিন্টা জিজ্ঞেস করল, "আঞ্জোনির মন্ত্র ? কী সুন্দর আঞ্জোনিটা ধলার জঙ্গল থেকে দাদা ধরে এনেছিল, তার লেজটাকে একেবারে···"

পুণ্যকাকা মাথা নেড়ে বলে, "না রে। এতদিন তো মনে করেছি মানুষকে ভাল রাখাটাই মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ, মনে করতাম মানুষ ভাল থাকলেই সব ভাল থাকবে, না !"

পিন্টা-মিন্টার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল পুণ্যকাকা।

পিন্টা-মিন্টা বলল, "ওঃ।"

পুন্নাকাকি চুপ করে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, সে বলল, "ও-মন্ত্র তো তোরাই সবচেয়ে ভাল জানিস, গুনিন ধরছিস কেন ?"

"না কাকি, আমরা কিচ্ছু জানি না, বিশ্বাস করো, একফোঁটা···"

মিন্টা বলল, "যদি জানতাম তা হলে তো এতক্ষণে···"

পুন্নাকাকি বলল, "যা,নিয়ে আয় এখানে সবক'টাকে, আমি একবার চেষ্টা করে দেখব।"

"কাকি, তুমি মন্ত্র জানো ?"

"হ্যাঁ, এক্ষুনি তো তোদের কাছেই শিখলাম।"

"হ্যাঁরে, সত্যি কথা। ভালবাসাই হল ওদের বাঁচানোর সবচেয়ে বড় মন্ত্র। যা, নিয়ে আয়।"

ওরা আবার দৌড়তে লাগল আরও জোরে, তীরের গতিতে।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

তবু এই বাড়িটার ওপর আমি নজর রাখব···
সাবধান···সেই লোকটা বেরিয়ে যাচ্ছে···আরে! হাতে একটা পোঁটলা !
নিশ্চয় কুটুস ! ঠিক জানি !
লোকটা ওকে মারছে !···আমাকে কিছু একটা করতেই হবে !
বাড়িটার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে মোড়ে অপেক্ষা করতে পারি···
একটা লাঠি !···খাসা ! এখন এমন কিছুরই দরকার ছিল !
মাথা ঠাণ্ডা রেখে চুপ করে দাঁড়াও···ও আসছে···
খট
খট
অ্যাঁ !···দুঃখিত !
এসব কী হচ্ছে ?···আমাকে এখানে কেউ দেখলে ধরে ফেলবে···পালাও বাগ্‌সি !
কী মারাত্মক ভুল !···পালাতে হবে, এবং জলদি !···ধরা পড়লে দারুণ বিপদে পড়ব !
গুড়ুম
গুড়ুম
ডেমক্লিসের তলোয়ার অস্ত্রব্যবসায়ী

আমেরিকায় টিনটিন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাট ম্যান
মিস পার্কার, মনে হয় না ওরা গুলি চালাবে। তবু পিছনে বসুন।
ব্যাটম্যান, কাজটা বিপজ্জনক।
বিপদ
মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ব্যাটম্যান আর রবিন বিগ টিম হেলের খোঁজে যাচ্ছে। বিগ টিম ভয় দেখিয়ে রুথ পার্কারের মূল্যবান তেলসমৃদ্ধ জমি জোর করে কিনতে চায়!
11
শেরিফ, আমি ওদের চিনি!
বদমাশরা গুলি চালালে ওদের আমি মজা টের পাইয়ে দেব!
বিপদ
বিপদ
এখনও তো বিস্ফোরণের শব্দ হল না!
বস্! নাইট্রোট্রাক এদিকে ছুটে আসছে!
ব্যাটম্যানকে গুলি করো!
বুদ্ধু! বিস্ফোরণ হতে পারে! ট্রাকও ওলটাতে পারে!
চলো, গাড়িতে চেপে পালাই!
ওরা পালাচ্ছে! ওদের সঙ্গে ছুটে পারব না!
স্পিড নেবার আগেই ওদের ধরে ফেলব!
ট্রাক যেভাবে লাফাচ্ছে, যে-কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে!
একটা গুলি যদি লাগে!
ট্রাকটা লাফিয়ে চলে গাড়িটাকে ধরে ফেলল!
সরে যাও! সবাই মরব!
টিম, তুমি নিরুপায়!
তুমি ধরা না দিলে নয়!
ধরা দিচ্ছি! কিন্তু ব্যাটম্যান খ্যাপার মতো নাইট্রোট্রাকে তেড়ে না এলে পালিয়ে যেতাম!
খ্যাপা তোমাদের মতো অপরাধীরা, তাদের যারা ধরে তারা নয়!
মরতে আমরাও চাই না— তাই তোমাদের পিছু নেবার আগে ট্রাক থেকে বিস্ফোরক সরিয়ে রেখেছিলাম!
তা হলে গুলি করতে পারতাম!
আঁ!
আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন! জেতার আশা না করেই উনি লড়ে গেছেন!
উনি নিশ্চয় জানতেন আপনি জিতবেন! টিমরা শেষ পর্যন্ত হেরে যায়!
পরদিন সকালে গোথাম সিটিগামী প্লেনে...
ব্রুস, রুথ পার্কারের দুর্দিন শেষ! একদিন ও তোমারই মতো ধনী হবে!
ডিক, যার যা প্রাপ্য সে তাই পায়! টিমও পাবে! বাকি জীবন ও জেলে কাটাবে!

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

বসবার ঘরে গণ্ডারের পাল

পি'টার আর জুডি একদিন বিকেলবেলা গাছের তলায় কুড়িয়ে পেল আশ্চর্য এক খেলার বোর্ড। বাবা-মা কেউ বাড়ি নেই সেদিন। বোর্ডটা নিয়ে বাড়ি গেল তারা। তারপর বোর্ডের ওপর যেই না ছক্কা গড়িয়ে দিয়েছে, অমনি ঘটতে লাগল আজগুবি আর ভয়ঙ্কর সব ঘটনা। প্রথমে গণ্ডারের পাল ঢুকে পড়ল বসবার ঘরে, রান্নাঘরের জানলা ভেঙে লাফিয়ে পড়ল একগাদা বাঁদর, আট ফুট লম্বা অজগর শোবার ঘরের বাতিদান নিয়ে খেলতে লাগল। তারপর ঝড় শুরু হল, সারা বাড়ি ভরে গেল আগ্নেয়গিরির ফুটন্ত লাভায়। ভয়াবহ সর্বনাশ হবার আগেই যদিও পল আর জুডি কোনওমতে বন্ধ করতে পেরেছিল খেলাটা, বাবা-মা বাড়ি ফিরে বুঝতেও পারেননি কিছু। কেননা, একমুহূর্তে সব মিলিয়ে গিয়ে আগের মতো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশপাশের বাড়ির ছেলেমেয়েরা ওই বোর্ড নিয়ে গেল খেলতে, ওরা জানে না তখনও কী ঘটতে পারে ছক্কা গড়িয়ে দিলে! এমনই আজব এক পৃথিবীতে ছোটদের নিয়ে যেতে পারেন ভ্যান আলসবার্গ।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম জনপ্রিয় এই লেখক ও শিল্পী তাঁর প্রত্যেক বইতেই তৈরি করেছেন কল্পনার মনমাতানো জগৎ, টানটান উত্তেজনা। ভুতুড়ে ছক্কা-বোর্ডের এই বইটির নাম 'জুমানজি'। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮১ সালে। আলসবার্গ পেয়েছিলেন আমেরিকার সবচেয়ে সম্মানজনক সাহিত্য পদক 'ক্যালডেকট মেডেল'। আরও অনেক বই লিখেছেন তিনি, পুরস্কৃত হয়েছেন দেশে-বিদেশে। বয়স চল্লিশ। থাকেন প্রভিডেন্স আর· আই-তে। লেখকজীবন শুরু ১৯৭৯তে, 'দি গার্ডেন অব আবদুল গামাজি' বইটি লিখে। দুটো বাচ্চা পিঁপড়ের নানারকম দুঃসাহসিক অভিযান নিয়ে লেখা 'টু ব্যাড অ্যানটস' (১৯৮৮) খুব সাড়া জাগিয়ে ছিল। এ-বছর ভ্যান আলসবার্গ লিখছেন একটি নতুন বই। 'সোয়ান লেক' রূপকথাগুলিকে আবার খুঁজে পাওয়া যাবে সেই বইতে, নতুন চেহারায়। সঙ্গে থাকছেন আর-একজন লেখক মার্ক হেলপ্রিন। ছবি আঁকবেন আলসবার্গ নিজেই। বইটি ছাপা হবে ২৭৫,০০০ কপি। প্রকাশক হ্যাউটন মিফিন, দাম : ১৯·৯৫ ডলার। ছোটদের বই ছাপার ইতিহাসে 'সোয়ান লেক' বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। কখনও কোনও ছোটদের বই এত কপি ছাপা হয়নি। লেখকরা বইটি লেখার জন্য আগাম ৮০১,০০০ ডলার পেয়েছেন।

'সোয়ান লেক'-এর ইলাস্ট্রেশন

'আমি সবসময় আমার মাথায় যেসব ঘটনা ঘুরে বেড়ায় সেসব লিখি। হতে পারে সেগুলো আটবছর বয়সের চিন্তাভাবনা। অথবা, হয়তো ছোটবেলায় যা-সব ভাবে সবাই, তার স্মৃতি এখনও আমার তাজা আছে।'
—ভ্যান আলসবার্গ

অভীক মজুমদার

অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ও রূপকথা

অ্যাডভেঞ্চার অমনিবাস
ধীরেন্দ্রলাল ধর
সাহিত্য বিহার, কলকাতা-৯
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—পঁচিশ টাকা
তৃতীয় খণ্ড—তিরিশ টাকা

ধীরেন্দ্রলাল ধরের ১৪টি একসময়কার শিহরন জাগানো বাস্তব ধর্মী উপন্যাসের সংগ্রহ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার কথা লিপিবদ্ধ আছে। ইতিহাসের দিক থেকেও এর মূল্য রয়েছে। লেখাগুলির রচনাকাল ১৯৩৪ থেকে ১৯৭১ সাল।

বিশ্বের রূপকথা
অনুবাদক : রমেশচন্দ্র মজুমদার ও উজ্জ্বলকুমার
প্রকাশক : নবকল্প, কলকাতা-৯
দাম : দশ টাকা

বাংলা সাহিত্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রূপকথা কবে থেকে অনূদিত হয়ে আসছে তার সঠিক হিসেব জানা না থাকলেও এটা নিশ্চিত যে, আমাদের পুরাণ ও পঞ্চতন্ত্রের সঙ্গে ঠাকুরদাদার ঝুলি, ঠাকুরমার ঝুলির পাশাপাশি কখন যেন সেইসব অনুবাদ জায়গা করে নিয়েছে।

'বিশ্বের রূপকথা' হাতে পেয়ে রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম প্রথমটা। এই সঙ্কলনে আছে ইংল্যান্ড, ইউরোপ, জার্মানি, আফ্রিকা, নাইজিরিয়া, রাশিয়া, গ্রিস, ডেনমার্ক, ফরাসি থেকে ব্যাবিলন, হ্যামেলিনের বাঁশিওলার সেই অসাধারণ গল্পসহ আমাদের পুরাণ ও সাঁওতালি রূপকথার অনেক গল্প। যা এক মলাটের বইতে দুর্লভ। কিন্তু সব অনুবাদই স্বচ্ছন্দ অনুবাদ নয়।

শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যালয় পরিচিতি

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ

চারদিকে নানা রঙের ফুলের সমারোহ, পরিচ্ছন্ন চত্বর—পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে সব মিলিয়ে এক মনোরম প্রশান্ত পরিবেশ। লিখেছেন **বিশ্বদেব বিশ্বাস**

পুরুলিয়া স্টেশন থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার উত্তরে, বরাকর রোডের উপর ৮৫ একর জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ। চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ১৯৫৮ সালে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। স্বামী হিরন্ময়ানন্দ মহারাজ এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। শিক্ষাদানের ব্যাপারে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের কাজে রামকৃষ্ণ মিশন সারা দেশ জুড়ে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ তারই একটি। বড় বড় গাছের ছায়াঘেরা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। চারদিকে নানা রঙের ফুলের সমারোহ, পরিচ্ছন্ন চত্বর। সব মিলিয়ে এক মনোরম প্রশান্ত পরিবেশ। ভাস্কর সুনীল পালের নকশায় তৈরি বিশাল মন্দির,কলাভবন, স্কুলভবন, সভাগৃহ, গ্রন্থাগার। দেওয়ালে দেওয়ালে শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা বিরাট বিরাট ছবি। পাশেই একটা ছোট পশুশালা। সেখানে খরগোশ ও হরিণের দল, হাঁসের ডাক, ময়ূরের নাচ, পাখির গান সব মিলিয়ে এক অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ। শুধু লেখাপড়ার জন্যই লেখাপড়া নয়। কী করে নিজেদের জীবন সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে সেভাবেই ছেলেদের তৈরি করা হয়। এখানেই পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ সম্পূর্ণ আবাসিক। বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা ৬৫৮ জন। বিভিন্ন রাজ্যের ছেলেরা এখানে পড়াশোনা করছে। বিদ্যাপীঠের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সম্পাদক স্বামী উমানন্দ মহারাজ প্রথমেই উল্লেখ করলেন এখানকার শিক্ষকদের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও উৎসর্গীকৃত প্রাণের কথা। এখানে ছেলেদের সেভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়, যাতে তাদের নৈতিক চরিত্র গড়ে ওঠে, মনের শক্তি বাড়ে, তাদের বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে।

স্বামী ঈশত্মানন্দ জানালেন,বিদ্যাপীঠে যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলেরা আছে, তেমনি খুব দরিদ্র ও ধনী বাড়ির ছেলেরাও আছে। সবাই সমান সুযোগ পায়। শিক্ষক সন্ন্যাসী সকলের কাছেই সমান যত্ন এবং ভালবাসা পায়। ছেলেরাও সুন্দরভাবে মিলেমিশে থাকে। বিদ্যাপীঠের সবক'টা পূজা-অনুষ্ঠানেও সমানভাবে অংশ নেয়।

বিদ্যাপীঠে মোট ৫৪ জন শিক্ষক এবং সাধু ও ব্রহ্মচারী মিলে ১৫জন আছেন। ছাত্রদের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা বোধ ও শিক্ষকদের প্রচণ্ড আন্তরিকতাই প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় এত ভাল ফল করার প্রধান কারণ বলে প্রধানশিক্ষক স্বামী আত্মপ্রভানন্দ মনে করেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই

> শিক্ষক ও সন্ন্যাসীরা ছেলেদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যান, তারপর অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিজেদের উজাড় করে দেন। এখানে ছেলেদের সেভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়, যাতে তাদের নৈতিক চরিত্র গড়ে ওঠে, মনের শক্তি বাড়ে, তাদের বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে।

স্কুলের ফলাফল খুব ভাল হয়। প্রত্যেক বছরই প্রথম কুড়িজনের মধ্যে এই স্কুলের দখলে থাকে বেশ কয়েকটি স্থান।

বিদ্যাপীঠের পরীক্ষা গ্রহণ অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হয়। পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ একটা আলাদা বিভাগই আছে। দুর্গাশঙ্কর মল্লিক এই বিভাগের প্রধান। প্রতিটি ছেলের ক্রমাগত উন্নতির হিসাব রাখা এবং তা নিয়ে সমানে পর্যালোচনা করা হয়। কোনও একটা পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ছেলেদের মেধা বিচার করা হয় না। কোনও ছেলে একটা পরীক্ষায় খারাপ করলেই শুরু হয়ে যায় অনুসন্ধান। খুঁজে বার করা হয় কোথায় তার অসুবিধে হচ্ছে। তারপর আরম্ভ হয় বিশেষ কোচিং। দুর্গাশঙ্করবাবু জানালেন,সারা বছর ধরেই পরীক্ষা নেওয়া হয় তবে প্রধান পরীক্ষা হয় মোট চারটে। এ ছাড়াও আছে হোমওয়ার্ক, ক্লাস-টেস্ট, শিক্ষকদের নিজস্ব বিচারে দেওয়া নম্বর সব মিলিয়ে তৈরি হয় প্রমোশনের বাৎসরিক রিপোর্ট।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার নিয়মকানুন

প্রতি বছর অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্র-ভর্তির জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। স্কুলের কাছে আবেদন করলে একটি ছাপানো ভর্তির ফর্ম, প্রতি বিষয়ের নমুনা প্রশ্নপত্র, বিদ্যাপীঠের প্রসপেক্টাস ও অন্যান্য নিয়মাবলী প্রত্যেক আবেদনকারীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পুরনো শিক্ষাবর্ষের পরিবর্তন হওয়ার জন্য আগামী শিক্ষাবর্ষ কখন শুরু হবে এখনও জানা যায়নি। পুরুলিয়া, বেলুড়, কলকাতা, আসানসোল, গুয়াহাটি, আগরতলা, দিল্লি ও ঢাকায় পরীক্ষা নেওয়া হয়। এ ছাড়াও যে-কোনও জায়গার ছেলেরা নিকটবর্তী মিশনে পরীক্ষা দিতে পারে। সেখানে প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মিশন বিদ্যাপীঠে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ও

সারদা মন্দির : উঁচু ক্লাসের বিদ্যালয় ভবন (ইনসেট) প্রধানশিক্ষক : স্বামী আত্মপ্রভানন্দ মহারাজ

ইংরেজি । ভর্তির পরীক্ষাও নেওয়া হয় এই দুটি ভাষায় ।

বাংলা মাধ্যমের জন্য ছেলেদের শুধু বাংলা, অঙ্ক ও বুদ্ধির পরীক্ষা দিতে হয় । পঞ্চাশ নম্বরের পরীক্ষা, বুদ্ধির পরীক্ষা দশ নম্বরের মধ্যে ।

ইংরেজি মাধ্যমের জন্য ছেলেদের ইংরেজি, অঙ্ক, বুদ্ধির পরীক্ষা ও বাংলা অথবা হিন্দি । প্রশ্নপত্রেই উত্তর লিখে জমা দিতে হয় । চতুর্থ শ্রেণীতে বেশি ছাত্র নেওয়া হয়, ০—৭৫ জন । পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতেও অল্পসংখ্যক কিছু ছাত্র নেওয়া হয় ।

লিখিত পরীক্ষায় উপযুক্ত হলে সেই ছেলেদের মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য পুরুলিয়ায় ডাকা হয় । কৃতকার্য হলে ভর্তি করে নেওয়া হয় । ভর্তির পরীক্ষায় উপযুক্ত হলে অর্থের অভাব বাধা হয়ে দাঁড়ায় না । আট বছরের কম বয়সের ছেলেদের নেওয়া হয় না ।

পড়ার যে সময় বেঁধে দেওয়া আছে, তাই যথেষ্ট — রাজা মুখোপাধ্যায় ও সুমন্ত তেওয়ারি দশম শ্রেণী ।

নীলাংশুক হালদার

কমলেশ কুমার

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা মুখোপাধ্যায়

সুমন্ত তেওয়ারি

ষোলো বছর বয়সের রাজা মুখোপাধ্যায় দশম শ্রেণীর ছাত্র । ইংরেজি মাধ্যমে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল । প্রতিটি ক্লাসেই প্রথম হয়ে আসছে । ১৯৮৬, ৮৭,'৮৮ সালে সায়েন্স অ্যাপটিটু্যড ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় মেরিট সার্টিফিকেট পেয়েছে । নবম শ্রেণীর হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় অঙ্ক, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানে যথাক্রমে শতকরা ৯৫, ৯৩ ও ৯২ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছিল । কিন্তু অসুস্থতার জন্য বাৎসরিক পরীক্ষা দিতে পারেনি । প্রধানশিক্ষক জানালেন, ফাইনালেও প্রথম হওয়ার যোগ্য কিন্তু শেষ পরীক্ষা দিতে না পারায় বিদ্যাপীঠের নিয়ম অনুযায়ী রাজাকে প্রথম বলে ঘোষণা করা যায়নি ।

রাজার বদলে সুমন্ত তেওয়ারিই দশম শ্রেণীর প্রথম ছাত্র । সুমন্ত বলল, "আসলে রাজাই কিন্তু ক্লাসের প্রথম ছাত্র । অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে রাজা প্রথম ও আমি দ্বিতীয় হয়েছিলাম ।" শুনে ভাল লাগল । সুমন্তর বাবা সন্তোষ তেওয়ারি সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক । সুমন্ত পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে গল্পের বইও পড়ে ।রেফারেন্স বইও অনেক পড়ে । খেলাধুলোতেও সমান আগ্রহ । বিদ্যাপীঠের ঠাসা কাজের রুটিনের মধ্যে এত পড়ার সময় পায় কখন ? সুমন্ত ও রাজা দু'জনেই জানাল, স্কুলে ও ধামে পড়ার যে সময় বেঁধে দেওয়া আছে, তাই যথেষ্ট । নবম ও দশম শ্রেণীতে রাত্রে খাওয়ার পর এক ঘন্টা বেশি পড়ার সময় দেওয়া আছে । এস এ টি এস টি পরীক্ষায় চার বছর মেরিট সার্টিফিকেট পেয়েছে, সম্প্রতি রুরাল স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়েছে সুমন্ত ।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় নবম শ্রেণীর প্রথম ছাত্র । চতুর্থ শ্রেণী থেকেই প্রথম হয়ে আসছে । পড়ার সঙ্গে খেলাতেও সমান পারদর্শী । তিন বছর ধরে ফুটবল ও ক্রিকেটে বিদ্যাপীঠের প্রতিনিধি । অ্যাথলেটে ইন্টারমিডিয়েট চ্যাম্পিয়ান । মাধ্যমিক পাশ করার পর একটি বড় ক্লাবে যোগ দেওয়ার জন্য ডাক দিয়ে রেখেছেন ক্রিকেট কোচ ।

কমলেশ কুমার অষ্টম শ্রেণীর প্রথম ছাত্র । সপ্তম শ্রেণীতেও প্রথম হয়েছিল । লাজুক প্রকৃতির । খেলাধুলোয় বেশি আগ্রহ নেই । ইংরেজি ও হিন্দি সাহিত্য পড়তে ভালবাসে । বাবা বিহার স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের এঞ্জিনিয়ার । কমলেশ বড় হয়ে এগ্রিকালচারাল এঞ্জিনিয়ার হতে চায় ।

নীলাংশুক হালদার সপ্তম শ্রেণীর প্রথম ছাত্র । পঞ্চম শ্রেণীতে তৃতীয় ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়েছিল । ক্রমশ উন্নতি করার জন্য বিদাপীঠের বিশেষ উৎসাহজনক পুরস্কার পেয়েছে ।

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৯ ডলার অথবা ২১ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

নানারকম

ধাঁধা

"কলকাতার তিনশো বছর নিয়ে যত ছড়া আর যত কবিতাই লেখা হোক," ছোট্কা ধাঁধার খাতাখানার পাতা ওলটাতে-ওলটাতে বলছিল, "শ্রেষ্ঠ রচনা ঈশ্বর গুপ্তের। সেই, রেতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায়

আছি—এর কোনও তুলনা নেই। কলকাতা সম্পর্কে সর্বকালের সেরা লেখা। মশা থাকবেই, মাছি থাকবেই, কলকাতার হাজার উন্নতি হলেও এ-দুটো প্রাণীকে অবলুপ্ত করা সম্ভবপর নয়।"

হঠাৎ মশা-মাছির প্রসঙ্গ কেন তুলছে ছোট্কা, প্রথমটায় ভেবে পাচ্ছিলাম না।

কিন্তু ছোট্কার ব্যাপার, কার সাধ্য অনুমান করে। ধাঁধার খাতার একটা পাতায় এসে থামল ছোট্কা, তারপর বলল, "এবার একটা মাছির ধাঁধা নাও সঞ্জুবাবু। কলকাতার তিনশো বছরের উপহার।"

সেই ধাঁধা দিয়েই শুরু করি তা হলে।

প্রথম ধাঁধা ॥ দু'জন সাইকেল-চালক। একজন আসছে পুব থেকে পশ্চিমে, অন্যজন যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পুবে। ১৮০ কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে দু'জনে, সাইকেল চালনার শুরুতে। একটা মাছির কী খেয়াল হল, একজন চালকের কাঁধ থেকে উড়তে শুরু করে সোজা চলে গেল অন্য চালকের কাঁধে। তাকে ছুঁয়েই ফের ফিরে এল। প্রথমজনের কাছে। ফের উড়ল। ফের ফিরল।

এভাবে অস্থির মাছিটি কেবলই যাতায়াত করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দু'জন সাইকেলচালক যখন একেবারে একে অন্যের সামনাসামনি, তখন থামল মাছিটি।

মাছির গতি ছিল ঘণ্টায় তিরিশ কিলোমিটার। আর সাইকেল-চালকেরা প্রত্যেকে চালিয়েছে ঘণ্টায় পনেরো কিমি বেগে।

এবার বলো, মাছিটি কত কিলোমিটার ওড়াউড়ি করেছে?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ শূন্যস্থানে উপযুক্ত সংখ্যা বসাও

২২ (১০) ১৮
৩৪ (?) ১০

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও— চাঁপাদেরহাড়

গতবারের উত্তর ॥ (১) অমল ৫০, কমল ৩০ টাকা। (২) $১\frac{১}{২}$ । (৩) ভবানীভবন।

সত্যসন্ধ

মজার খেলা

এবারের মজার খেলাটা আসলে কথার খেলা। কথার প্যাঁচে বন্ধুদের বোকা বানানোর খেলা। আর তাই, না বললেও চলে যে, কোনও উপকরণ লাগবে না এবারের মজার খেলার জন্য।

উপকরণ লাগবে না, তবে বন্ধু নিশ্চিত লাগবে। বন্ধু না থাকলে খেলাটা দেখাবে কাকে? তাই অপেক্ষা করো। বন্ধুরা আসুক।

আড্ডা বেশ জমতে থাকুক। আর সেই জমাটি আড্ডায় এক সময় সুযোগ বুঝে তুমি খেলাটা হাজির করো বন্ধুদের সামনে। খেলাটা কী, তাই বলিনি এখনও। তাই তো? বেশ তো বলছি। মন দিয়ে শোনো।

তুমি করবে কি, ডান হাতের দুটো আঙুল উঁচু করে ধরে বাকি তিনটে আঙুল মুড়ে রাখবে। ধরো, তর্জনী ও মধ্যমা উঁচু করে ধরলে, আর বাকি আঙুল তিনটে মুড়ে রাখলে। বাঁ হাতের সব ক'টা আঙুলই মুঠো করে রাখবে। এটা অবশ্য বন্ধুদের সামনে তুলে দেখাতে হবে না। খুব স্বাভাবিকভাবেই বাঁ হাতটা পুরো মুঠো করে রাখবে। আর ডান হাতের দুটো আঙুল উঁচু-করে-ধরা

অবস্থায়, বন্ধুদের জিজ্ঞেস করবে, "বলো তো, ক'টা আঙুল আমি মুড়ে রেখেছি?"

হঠাৎ এই প্রশ্নে, বন্ধুরা উলটো বুঝবে। অনেকেই দেখবে, চট করে বলবে, দুটো।

তুমি তখন ভুল ভেঙে দেবে। বলবে না, দুটো আঙুল তো উঁচু করে রেখেছি। আমার প্রশ্ন হল, ক'টা আঙুল মুড়ে রেখেছি।

এবার বন্ধুরা ভাববে, এ-আর এমন কী শক্ত প্রশ্ন। তারা বলবে কেন, তিনটে?

তুমি তখন বলবে, এবারও হল না। বাঁ হাতের কথা ভুলে গেলে? মোট আটটা

আঙুল মুড়ে রেখেছি আমি। বন্ধুরা, তখন বুঝবে, ঠকে গেছে তারা। দেখবে, কী হাসাহাসির ব্যাপার হয়।

মজারু

কত কথা

ক্রিকেট এখন বারো মাসের তেরো পার্বণ হয়ে দাঁড়ালেও আগে কিন্তু শীতকালেই বসত এই খেলার জমজমাট আসর। তা সেই আগের দিনেরই তিনজন বিখ্যাত ভারতীয় বোলারের নাম নীচের শব্দসূত্রের মধ্যে দেওয়া থাকল। তোমরা সূত্র ধরে খুঁজে বার করো তো এঁরা কে কে?

(ক) সন্তুষ্ট, সদয়। (খ) মহাদেব। (গ) মঞ্চ।

২। আবার সেই এক শব্দের অক্ষর

উলটে-পালটে অন্য শব্দ তৈরির খেলা—জবান, কারক, রণপা।

৩। 'মসনদ' শব্দটির মধ্যে পর-পর মোট ক'টি এবং কী-কী শব্দ খুঁজে পেতে পারো?

উত্তর : ১। (ক) প্রসন্ন। (খ) চন্দ্রশেখর। (গ) বেদি। ২। বাজন, করকা, পারণ। ৩। সন, সনদ ও নদ— মোট তিনটি।

কথক

আশ্চর্য খেলা

টেব্‌ল-টপ ক্রিকেট: খেলার নিয়ম

খেলার উপকরণের কথা বলি প্রথমেই। 'আনন্দমেলা'র শেষ প্রচ্ছদের দু' পাতা জোড়া 'টেব্‌ল-টপ ক্রিকেট'-এর সবুজ মাঠটাকে (বোর্ডটাকে) খুলে তোমার সামনে রাখো। সবুজ বোর্ডের বাঁ পাশের পাতায় রয়েছে 'ব্যাটিং-কার্ড' আর 'বোলিং-কার্ড'। ... রেখা বরাবর পাতাটাকে দু'ভাগ করে নাও। ব্যাটিং সাইডের কাছে থাকবে ব্যাটিং-কার্ড আর বোলিং সাইডের কাছে থাকবে বোলিং-কার্ড। এবার একটা লুডো খেলার ছক্কা, ছক্কা চালার কাপ আর পনেরোটা লুডোর ঘুঁটি জোগাড় করো। লুডোর ঘুঁটির বদলে পিসবোর্ডও কেটে নিয়ে ঘুঁটি করতে পারো। এগারোটা ঘুঁটি লাগবে ফিল্ডিং সাইডের। দুটো ঘুঁটি (দু' রঙের)— দু'জন ব্যাটসম্যানের। বাকি রইল দুটো ঘুঁটি। একটা ঘুঁটি এখনকার মতো ব্যাটিং-কার্ডের ওপর, আর বাকিটাকে বোলিং-কার্ডের ওপর রেখে দাও। একটা কাগজ-পেন্সিলও লাগবে স্কোর লেখার জন্য।

দু'জনে বসে টেব্‌ল-টপ ক্রিকেট খেলা যায়। ইচ্ছে করলে ওয়ান-ডে ম্যাচও খেলতে পারো। টেস্ট খেলাও সম্ভব।

ওয়ান-ডে ক্রিকেট

প্রথমেই ঠিক করে নাও ক' ওভারের খেলা হবে। কুড়ি, তিরিশ না আরও বেশি। ওভারের সংখ্যা যত বাড়বে, খেলাও চলবে তত বেশি। আরও একটা জিনিস ঠিক করে নাও, প্রত্যেক দল ক' ওভার স্পিন আর ক' ওভার ফাস্ট বোলিং করবে। এবার দুই দলের হয়ে তোমরা দু'জনে টস করে স্থির করো, কে প্রথমে ব্যাটিং করবে, আর কেই-বা ফিল্ডিং।

ক্রিকেট খেলার মাঠ : ফিল্ডিং সাইড তার এগারোজন খেলোয়াড় বসাবে এই মাঠে। মাঠের মধ্যে 1 ও 23 সংখ্যক জায়গায় উইকেটকিপার ও বোলার বসবে। বাকি ন'জনকে 2 থেকে 22 সংখ্যক জায়গার মধ্যে ইচ্ছেমতো বসানো যেতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, (ক্রিকেটের মাঠেও সে-কথা লেখা আছে), মাঠের একেবারে বাইরের বর্তনীর মধ্যে (সবচেয়ে সবুজ অংশে) তিনজনের বেশি এবং মধ্যবর্তী বর্তনীর মধ্যে (মাঝারি সবুজ অংশে) পাঁচজনের বেশি ফিল্ডার বসানো চলবে না। এবং একটি ওভার (ছ' বল) শেষ না হলে ফিল্ডিংয়ের রদবদল করারও নিয়ম নেই।

ব্যাটিং ও বোলিং-কার্ড : ব্যাটিং সাইড 'ডিফেন্সিভ' বা 'অফেনসিভ' যে-কোনও পদ্ধতিতে খেলতে পারে। তবে একটা ওভার শেষ না হলে খেলার পদ্ধতি বদল করতে পারবে না। সেইসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে, ডিফেনসিভ পদ্ধতিতে খেললে যেমন আউট হওয়ার আশঙ্কা কম, তেমনই রান তোলার হারও অপেক্ষাকৃতভাবে কমবে।

বোলিং সাইডও ইচ্ছেমতো ফাস্ট অথবা স্লো বোলিং করতে পারে। তবে ওভার শেষ হওয়ার আগে পদ্ধতি পালটানো সম্ভব নয়। শুরুতে কম করে পাঁচ ওভার ফাস্ট বোলিং করতেই হবে। তারপর খেলার শুরুতে নির্ধারিত ফাস্ট ও স্লো বোলারের ওভারের হিসাব রক্ষা করে অদলবদল করা যেতে পারে।

প্রথম চাল দেবে বোলিং সাইড। তারপর ব্যাটিং সাইড। ব্যাটিং ও বোলিং সাইডের এই দুই চাল অনুসারে ঠিক হবে ব্যাটসম্যান কত রান করল কিংবা করতে পারল না, অথবা আউট হল কি না।

বোলিং ও ব্যাটিং কার্ডের 'Start' স্থানে একটা করে ঘুঁটি বসিয়ে নাও। তারপর বোলিং সাইড প্রথম ছক্কা চালবে। ধরো, চার পড়ল, তার মানে ঘুঁটিটাকে 4 নম্বর ঘরে নিয়ে আসতে হবে। ব্যাটিং সাইড চাল দেওয়ার পর আবার বোলিং সাইডের পালা আসবে (ওভারের দ্বিতীয় বল)। ধরো,তখন 'ছয়' পড়ল। ঘুঁটিটা তার মানে 4 সংখ্যক ঘর থেকে গোলাকার পথে ছ' ঘরে এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ 1 সংখ্যক ঘরে এসে বসবে।

একইভাবে বোলিং সাইড প্রথম চাল দেওয়ার পর (প্রথম বলের পর) ব্যাটিং সাইড ছক্কা চালবে। তার মানে ব্যাটসম্যান স্ট্রোক করবে। ধরো, ব্যাটিং সাইড ছক্কা চেলে পাঁচ ফেলল। তার মানে ঘুঁটিটা এসে বসবে 5 নম্বর ঘরে। (ব্যাটিং কার্ডের প্রত্যেকটা খোপের মাথার ডান দিকে যে সংখ্যাটা রয়েছে, সেই অনুসারে। খোপের মাঝখানে কালো বৃত্তের মধ্যে লেখা সংখ্যাগুলি নয়)। ব্যাটিং-কার্ড দিয়ে ঘুঁটিটা কোন পথে এগোবে আর একটু ভাল করে বলি। 'Start' থেকে শুরু করে ছক্কার দান অনুসারে ঘুঁটিটা প্রথম সারির বাঁদিক থেকে ডান দিকে, ডান দিকের শেষ ঘর (7 নম্বর) থেকে দ্বিতীয় সারির ডান দিকের প্রথম ঘর (8 নম্বর) হয়ে ডান থেকে বাঁ দিকে এগোবে। দ্বিতীয় সারির শেষ ঘরে (14 নম্বর) পৌঁছবার পর ঘুঁটি নেমে আসবে তৃতীয় সারির বাঁ দিকের প্রথম ঘরে (15 নম্বরে)। এবং আবার বাঁ থেকে ডান দিকে এগোবে (তীর চিহ্নগুলি লক্ষ করো)। তৃতীয় সারিরশেষ ঘরে পৌঁছলেই ঘুঁটিকে আবার প্রথম সারির সবচেয়ে বাঁ দিকের ঘরে (1 নম্বরে) ঠেলে দিতে হবে। ওভার (ছ' বল) শেষ হলে ঘুঁটি আবার Start থেকে পুনরায় যাত্রা শুরু করবে।

কোনও ওভারে একটা 'নো বল' হলে, সেই ওভার অবশ্য সাত বলের পর শেষ হবে। তবে এক ওভারে ফাস্ট বোলিংয়ের ক্ষেত্রে একবারের বেশি নো বল বা 'ইয়র্কার' হবে না। আর স্লো বোলিংয়ের ক্ষেত্রে একবারের বেশি স্পিন নয়। যদি এক ওভারে দ্বিতীয়বার নো বল, ইয়র্কার বা স্পিন পড়ে, তা হলে এই ঘর তিনটের সঙ্গে লাগোয়া বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে-থাকা অংশের নির্দেশ মানতে হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় বার নো বল পড়লে সেটা হবে 'হাফ ভলি' আর দ্বিতীয় বার ইয়র্কার বা স্পিনের ক্ষেত্রে সেটাকে 'লং হপ' ধরা হবে।

স্কোর : ব্যাটিং-কার্ডের বিভিন্ন ঘরে

জীবনের সকল আনন্দের সাথী টাইমেক্স

নির্দেশ আছে কখন কী স্কোর হবে। অনেক ঘরে দেখা যাবে কয়েক ধরনের স্কোর হওয়ার সম্ভাবনা। যেমন একটা ঘরে রয়েছে— 3 (Spain), 3 or 4 (Fast), তার মানে ব্যাটসম্যান স্পিন বোলিংয়ের ক্ষেত্রে 3 রান পাবেই। আর ফাস্ট বোলিং হলে দেখতে হবে, বলটা যে পজিশনে গেছে সেখানে ফিল্ডার আছে কি না। ফিল্ডার না থাকলে '4' থাকলে '3'। অবশ্য রানের স্টিয়ার/কাট করে (তার মানে ব্যাটিং-কার্ডের ওই ঘরে তার ঘুঁটি এসে বসে) তা হলেই ক্যাচ উঠবে। ক্যাচটা কোথায় উঠবে (বা বলটা ব্যাটসম্যান কোথায় মেরেছে) সেটাও ব্যাটিং-কার্ডের প্রত্যেকটা ঘরে লেখা আছে। কালো বৃত্তের মধ্যে বসানো সংখ্যাটা নির্দেশ করছে ফিল্ডারের পজিশন। ধরা যাক, ব্যাটসম্যান বলটাকে পাঠিয়েছে To deep fine leg (21). এবার উঠেছে এবং বলটা গেছে 10 নম্বর পজিশনে, মিড অফ-এ। এবার লক্ষ করো মাঠের ওই পজিশনে ফিল্ডার আছে কি না। থাকলেই আউট, পরের ব্যাটসম্যান খেলতে নামবে। আর ফিল্ডার না থাকলে পুরো চার রানই পাবে, আউট হবে না।

ঐ ক্ষেত্রে সুইং না হয়ে বলটা যদি রাইজিং ডেলিভারি হত, তা হলে ড্রাইভ করলে ক্যাচ উঠত না। আউড। না থাকলে যেহেতু ফাস্ট বোলিং হচ্ছে, 4 রান [যদি এক্ষেত্রে ফাস্ট বোলার রাইজিং ডেলিভারি না পাঠিয়ে গুড লেংথ বা লং হপ দিত; তা হলে ফিল্ডার থাকলেও আউট হত না, তবে, 4 রানের বদলে 3 রান পেত ব্যাটসম্যান।] প্রত্যেক ওভার শেষ হওয়ার পর ব্যাটিং ও বোলিং কার্ডের Start থেকে আবার ঘুঁটি এগোতে শুরু করবে। ওভারের শেষে বোলার ও

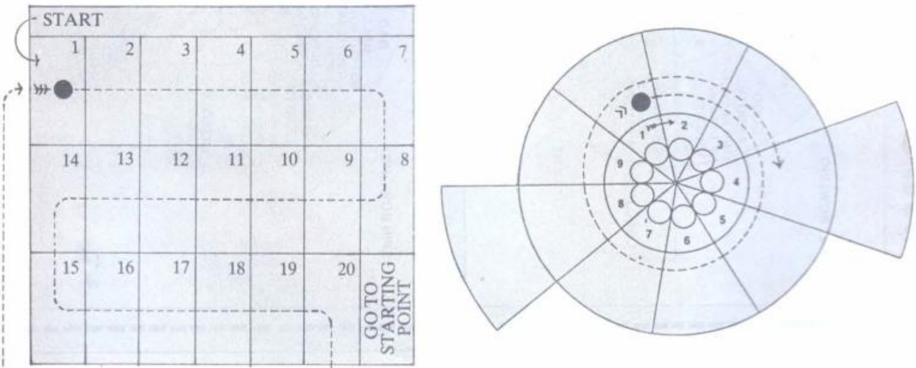

ব্যাটিং ও বোলিং কার্ড দিয়ে কীভাবে ঘুঁটি এগোবে দেখানো হয়েছে

হিসেব করার আগে দেখা দরকার ব্যাটসম্যান আউট হয়েছে কি না।

আউট : বোলিং কার্ডের বিভিন্ন ঘরে নির্দেশ দেওয়া আছে, কোন ধরনের বলে কী স্ট্রোক করলে আউট হবে বা আউট হবার আশঙ্কা ইত্যাদি। যেমন ইয়র্কার পড়লে ব্যাটসম্যানকে 'ব্লক' করতেই হবে, না হলে বোল্ড। আবার লং হপ বা হাফ ভলি পড়লে যাই মারুক, আউট হবে না। নো বলের ক্ষেত্রেও তাই, তবে ব্যাটসম্যান কোনও রান করতে না পারলে এক রান যোগ হবে ইত্যাদি। লক্ষ করে দ্যাখো, গুড লেংথ, সুইং, রাইজিং ডেলিভারি ও স্পিন বল পড়লে ক্যাচ আউট হওয়ার আশঙ্কা আছে। ধরো, বলটা রাইজিং ডেলিভারি। বোলিং কার্ডের ওই ঘরটায় লেখা আছে 'May be Caught if tries Streer/Cut এখন ব্যাটসম্যান যদি এই বল করার পর দেখতে হবে ওই 21 নম্বর পজিশনে ফিল্ডার আছে কি না। ফিল্ডার থাকলে আউট। না থাকলে রান পাবে আগের নির্দেশ অনুসারে।

উদাহরণ : ধরো, বোলিং-সাইড ফাস্ট বল করছে আর ব্যাটিং সাইড ডিফেনসিভ ব্যাটিং।

প্রথম ছক্কা চালবে বোলিং সাইড। ধরা যাক, ছয় পড়েছে। তার মানে ঘুঁটিটা বোলিং কার্ডের 6 নম্বর ঘরে বসল। সেখানে লেখা আছে— Swing : May be caught if tries drive or lofty shot. এবার ছক্কা চালবে ব্যাটিং সাইড। ধরো, পড়ল পাঁচ। তার মানে ঘুঁটিটা বসল 5 নম্বর ঘরে (ব্যাটিং কার্ডের প্রত্যেক খোপের মাথায় ডান দিকের সংখ্যা)। এখানে লেখা আছে : Drive to mid off (10) score 1 or 4. ব্যাপারটা তা হলে এই দাঁড়াল যে, সুইং বল সত্ত্বেও ড্রাইভ করেছে ব্যাটসম্যান। তার মানে ক্যাচ তখন 10 পজিশনে ফিল্ডার থাকলে 1 রান, না থাকলে 4 রান পেত।]

এবার ওভারের দ্বিতীয় বল। ধরো, বোলিং সাইডের আবার ছক্কা পড়ল। বোলিং কার্ডে তার ঘুঁটিটা যে জায়গায় ছিল(6 নম্বর ঘরে), সেখান থেকে ছ' ঘর এখন এগিয়ে গিয়ে বসবে 3 নম্বর ঘরে।

দ্বিতীয় বল করার পর ধরো, ব্যাটিং সাইড ছক্কা চেলে ফেলল তিন। তার মানে ঘুঁটিটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে প্রথমে দু' ঘর এগিয়ে তারপর আরও এক ঘর নীচে নেমে (তীরচিহ্ন ধরে) 8 নম্বর ঘরে ঢুকল।

এবার তা হলে বলটা রাইজিং ডেলিভারি আর ব্যাটসম্যান করেছে স্টিয়ার/কাট। বল গেছে থার্ডম্যান অঞ্চলে (3 নম্বর পজিশনে)। স্কোর হতে পারে 3 (Spin) কিংবা 3 or 4 (Fast) এক্ষেত্রে যেহেতু ক্যাচ ওঠার আশঙ্কা আছে, প্রথমেই দেখতে হবে 3 নম্বর পজিশনে ফিল্ডার আছে কি না। থাকলে ব্যাটসম্যান তাদের খেলার পদ্ধতি যেমন বদল করতে পারে, তেমনই ফিল্ড পজিশনও।

টেস্ট ম্যাচ

টেস্ট ম্যাচ খেলার সময় দুই দলই দু' ইনিংস করে ব্যাট করবে। এখানে স্লো বা ফাস্ট বোলারের ওভারের সংখ্যা আগে থেকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। বলাই বাহুল্য, টেস্ট ম্যাচের ক্ষেত্রে অফেনসিভ ব্যাটিং করা মানেই অহেতুক ঝুঁকি নেওয়া। টেস্ট ম্যাচের সময়ে মাঠে ফিল্ডার বসানোরও কোনও কড়াকড়ি নেই।

সব শেষে একটা কথা জানিয়ে রাখি, অবশ্য তোমরা নিজেরাও হয়তো ইতিমধ্যে তা লক্ষ করেছ। টেব্‌ল-টপ ক্রিকেটের মাঠে একজন ডানহাতের ব্যাটসম্যানের হিসাবে ফিল্ডারদের পজিশনের নাম দেওয়া হয়েছে। আর ওভার-শেষে এখানে বোলার নয়, দুই ব্যাটসম্যানকেই প্রান্ত বদল করতে হবে।

জীবনের সকল
আনন্দের সাথী টাইমেক্স

TABLE-TOP CRICKET

DEFENSIVE BATTING

START

DRIVE 1 TO DEEP MID-OFF 12 SCORE 3 OR 4	HIT 2 TO DEEP SQUARE LEG 17 SCORE 3 OR 4	STEER/CUT 3 TO DEEP FINE LEG 21 SCORE 3 (SPIN) 3 OR 4 (FAST)	BLOCK 4 TO SILLY POINT 7 SCORE 2	DRIVE 5 TO MID-OFF 10 SCORE 1 OR 4	DRIVE 6 TO LONG ON 13 SCORE 3 OR 4	MISS HIT 7 SCORE NIL
HIT 14 TO FINE LEG 22 SCORE 1 OR 4	BLOCK 13 TO COVER POINT 8 SCORE 2	DRIVE 12 TO SQUARE LEG 19 SCORE 2 OR 4	BLOCK 11 TO MID-WICKET 15 SCORE 2	BLOCK 10 TO SHORT LEG 18 SCORE 2	DRIVE 9 TO DEEP MID-OFF 11 SCORE 3 OR 4	STEER/CUT 8 TO THIRD MAN 6 SCORE 3 (SPIN) 3 OR 4 (FAST)
HIT 15 TO EXTRA COVER 9 SCORE 3 OR 4	BLOCK 16 TO GULLY 4 SCORE 2	DRIVE 17 TO MID-ON 14 SCORE 2 OR 4	STEER/CUT 18 TO SLIP 2 SCORE 2 OR 4	STEER/CUT 19 TO LEG SLIP 20 SCORE 2 (SPIN) 2 OR 4 (FAST)	BLOCK 20 TO SILLY MID-ON 16 SCORE 1	GO TO STARTING POINT

OFFENSIVE BATTING

START

HIT 1 TO EXTRA COVER 9 SCORE 3 OR 4	LOFTY SHOT 2 TO DEEP FINE LEG 21 SCORE 6	STEER/CUT 3 TO POINT 5 SCORE 2 (SPIN) 2 OR 4 (FAST)	LOFTY SHOT 4 TO DEEP MID-OFF 11 SCORE 6	STEER/CUT 5 TO 1ST SLIP 2 SCORE 2 OR 4	DRIVE 6 TO MID-ON 14 SCORE 2 OR 4	LOFTY SHOT 7 TO DEEP MID-ON 12 SCORE 6
DRIVE 14 TO MID-OFF 10 SCORE 1 OR 4	STEER/CUT 13 TO THIRD MAN 6 SCORE 3 (SPIN) 3 OR 4 (FAST)	HIT 12 TO FINE LEG 22 SCORE 1 OR 4	STEER/CUT 11 TO SECOND SLIP 3 SCORE 2 (SPIN) 2 OR 4 (FAST)	MISS HIT 10 LBW IF IT IS SWING OR SPIN SCORE NIL	BLOCK 9 TO SILLY POINT 7 SCORE 2	BLOCK 8 TO SHORT LEG 18 SCORE 2
LOFTY SHOT 15 TO LONG ON 13 SCORE 6	HIT 16 TO SQUARE LEG 19 SCORE 2 OR 4	LOFTY SHOT 17 TO SQUARE LEG 17 SCORE 6	STEER/CUT 18 TO GULLY 4 SCORE 2 (SPIN) 2 OR 4 (FAST)	DRIVE 19 TO MID-WICKET 15 SCORE 2 OR 4	HIT 20 TO COVER POINT 8 SCORE 2 OR 4	GO TO STARTING POINT

FAST BOWLING

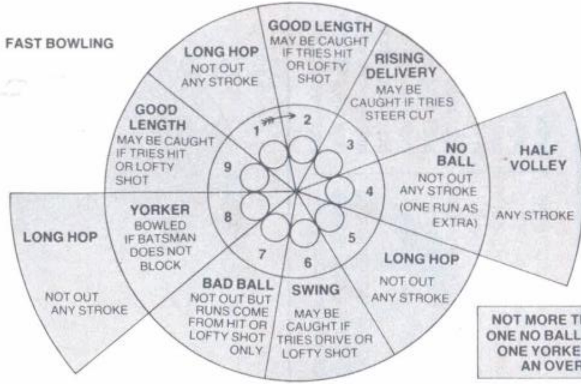

NOT MORE THAN ONE NO BALL AND ONE YORKER IN AN OVER

SPIN BOWLING

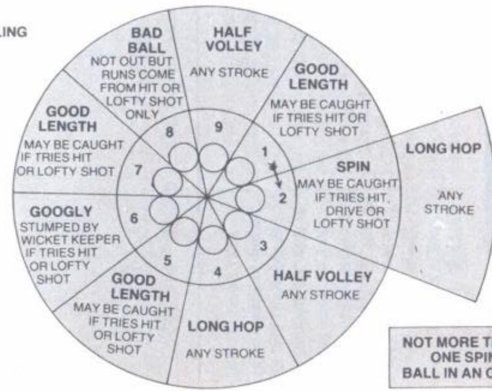

NOT MORE THAN ONE SPIN BALL IN AN OVER

TIMEX

TABLE-TOP CRICKET

SIDHARTHA GHOSH

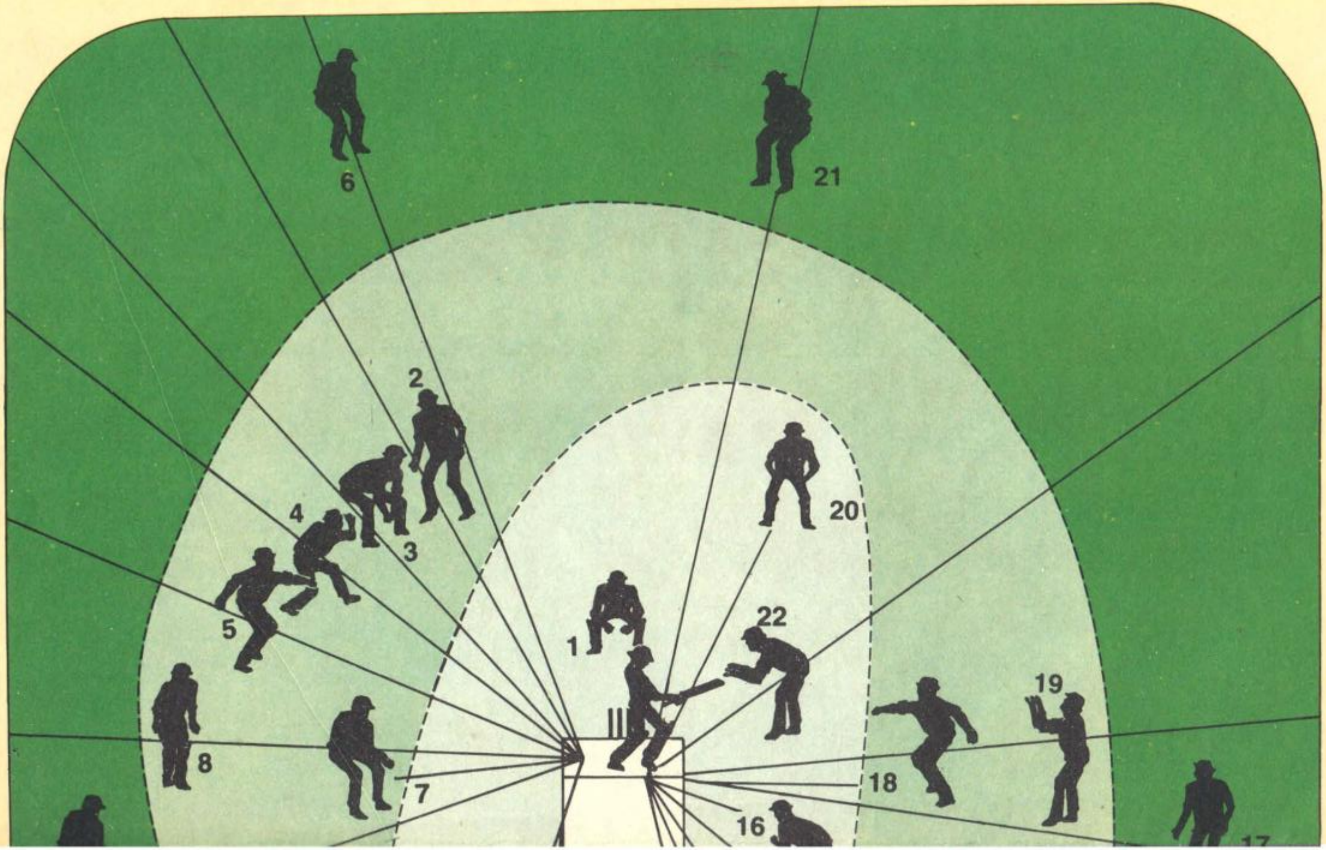

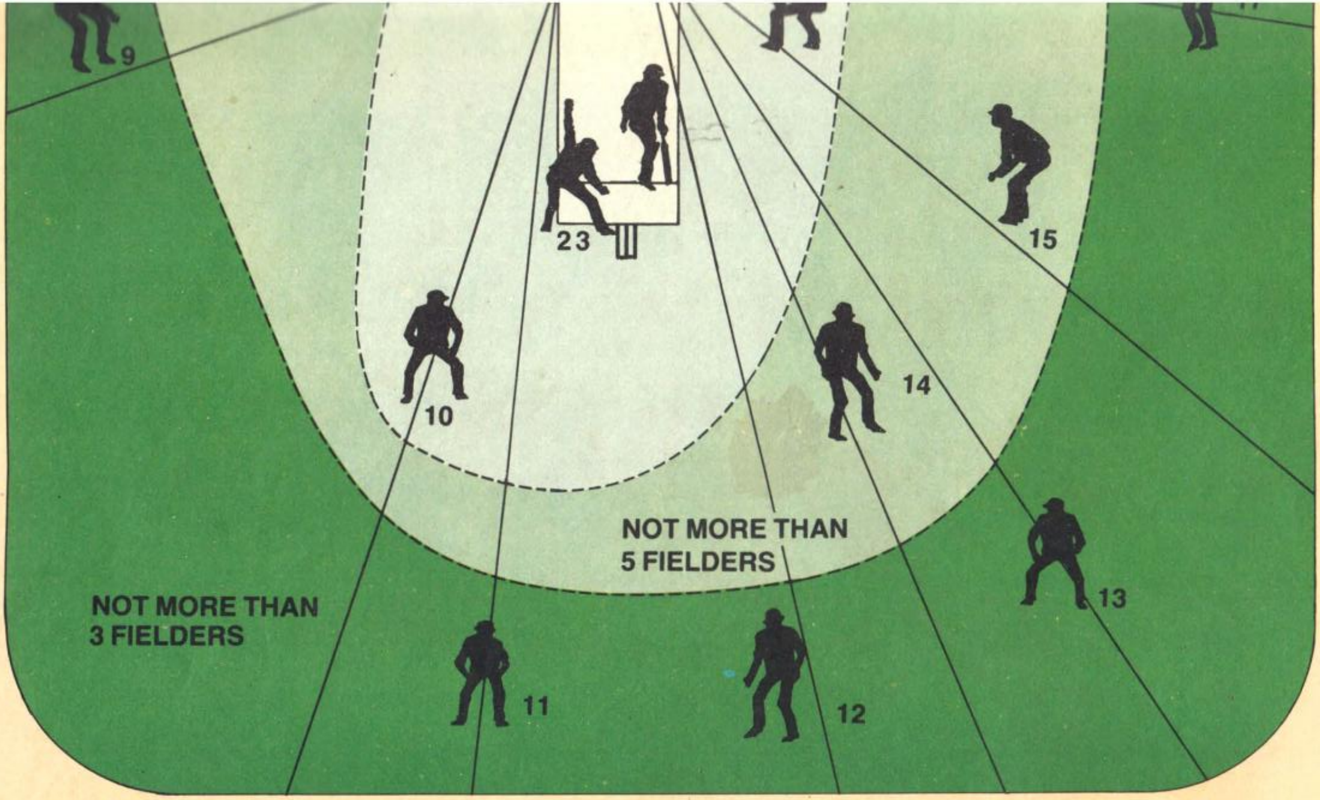

আনন্দমেলা

জীবনের সকল আনন্দের সাথী টাইমেক্স

পুরানো এবং নতুন কলকাতার যোগসূত্র থাক অটুট

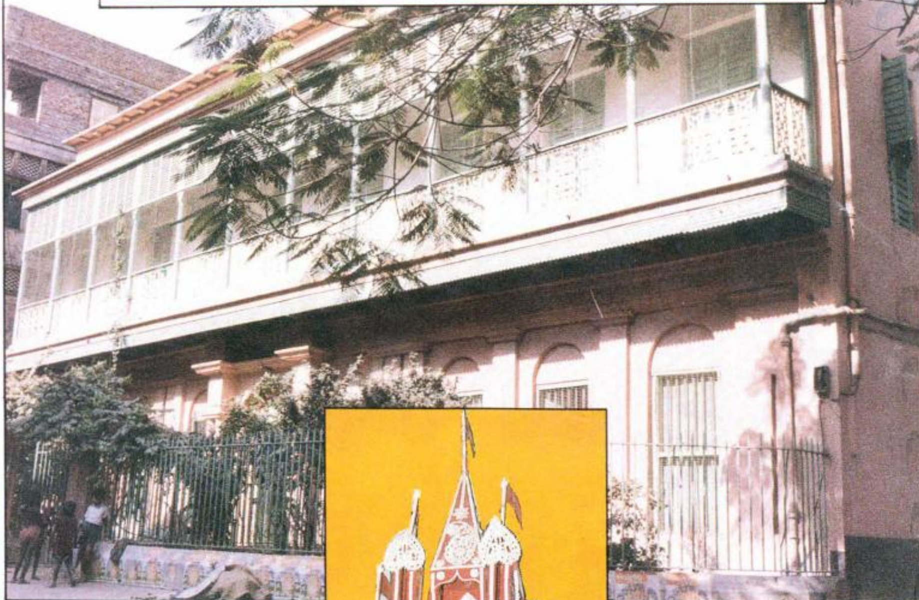

শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় কেল্লা
বাগবাজারের বলরাম বাটী

শ্রীরামকৃষ্ণের নিজে হাতে টানা রথ

টাইমেক্স ফিনান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

টাইমেক্স ভবন, পি-৩৫সি ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ অ্যাভিনিউ । কলকাতা-৭০০ ০০৩, ফোন : ৫৪-৪১৪৬

ANANDAMELA 7 FEBRUARY 1990 REGD.NO.
WB/CC/264 MH BY SOUTH 683 TN/MS(C) 731

॥ কথামৃত প্রকাশনীর বই ॥

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ ॥ স্বামী বিবেকানন্দ ৯
[বইটিতে যুক্ত হয়েছে স্বামীজীর জন্ম থেকে মহাসমাধি পর্যন্ত জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী]
বাঙলার তীর্থ ॥ শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য ২০
কলকাতা কল্পতরু ॥ রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ২০
কলকাতা বিচিত্রা ॥ জয়ন্তকুমার সিনহা ও দীপ্তিকুমার শীল সম্পাদিত ১০
কলকাতার কালী ॥ দীপ্তিকুমার শীল ৪
রাণী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত ॥ নির্মলকুমার রায় ৪০
শ্রীরামকৃষ্ণ : ভালবাসার ভগবান ॥ দীপ্তিকুমার শীল ১০
শ্রীশ্রীসারদামঙ্গল ॥ শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য ১৫
উপমা রামকৃষ্ণস্য ॥ বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী ২০
শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর স্বজনবর্গ ॥ নির্মলকুমার রায় ৩৫
অমৃতস্য পুত্রাঃ ॥ সুধীর বেরা ২০
রাগ মঞ্জরী ॥ শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় ৩০
সিন্ধু উপত্যকা ॥ জানকীবল্লভ পট্টনায়ক ২০
সঙ্গীতময় শ্রীরামকৃষ্ণ ॥ নির্মলকুমার রায় ২০
শ্রীরামকৃষ্ণ : কথা যাঁর অমৃত ॥ দীপ্তিকুমার শীল ২০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা ॥ নির্মলকুমার রায় ৩৫
বিশ্ববোধ বিবেকানন্দ ॥ নীহার মজুমদার ১০
শ্রীরামকৃষ্ণের কেল্লা কলকাতা ॥ দীপ্তিকুমার শীল ৮
শ্রীরামকৃষ্ণ মুখে শ্রীচৈতন্যকথা ॥ নির্মলকুমার রায় ১৫
মানুষের অধিকার ও স্বামী বিবেকানন্দ ॥ নীহার মজুমদার ১৫
কথামৃত প্রকাশনীর সাড়া জাগানো প্রয়াস এক নজরে মহাভারত ৩
কবিতায় বিবেকানন্দ (যন্ত্রস্থ) ॥ সঙ্কলন ও সম্পাদনা ডঃ শান্তি সিংহ
মহাতাপস লোকনাথ (যন্ত্রস্থ) ॥ শ্রীভগীরথ

॥ পরিবেশিত বই ॥

চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ ॥ সম্পাদনা : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ৭৫
গৃহীর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ॥ সুবোধরঞ্জন রায় ১২
শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের ছেলেরা ॥ তারকনাথ ঘোষ ২০
অভিজ্ঞান ॥ সুধীর বেরা ২০
রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমা ॥ মনোরঞ্জন বসু ১২
অমৃত-ধারা ॥ কুমুদবন্ধু বল ২৫
ভাবসমাহিত শ্রীরামকৃষ্ণ ॥ সম্পাদনা : রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ৩৫
শ্রীরামকৃষ্ণ নিকষে পঞ্চমণীষা ॥ তারকনাথ ঘোষ ২০
জাতীয় সংহতি বিশ্ব সংহতি বিশ্বশান্তি ॥ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র আচার্য ১ম ৫০ ২য় ৩৫

সর্বধর্ম সমন্বয়ের একমাত্র প্রবক্তা ও মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাবাশ্রিত বাঙলা মাসিকপত্র

কথামৃত পত্রিকা

গ্রাহকভুক্তি চলছে। প্রতি সংখ্যা ৩ বার্ষিক ২৫ সডাক ৩০

ক কথামৃত প্রকাশনী

প্রকাশন ও গ্রন্থ-বিপণন সংস্থা - ৫৭-সি কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দেশ-বিদেশে বই সরবরাহের সহযোগী প্রতিষ্ঠান টাইমেক্স ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউশন সার্ভিস
১৫৮ লেনিন সরণী, ২য় তল, রুম নং ৭, কলকাতা ৭০০ ০১৩। দূরভাষ : ২৭-৮৩২৫।